প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৫৭

প্রকাশক :
লেখক সমাবেশের পক্ষে
মিহির আচার্য
এ-১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭

মুদ্রাকর :
সুবলচন্দ্র ঘোষ
কালিকা জব প্রেস
১০৯ বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
পান্নালাক মল্লিক

সূচীপত্র

ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা ৯
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ইংরাজি শিক্ষা ২৫
সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে ২১
উনিশ শতকী বুদ্ধিজীবী মানস ২৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাৎপর্য ৩৬
সাহিত্য-ঐতিহ্যে ফাটল ও শরৎচন্দ্র ৪৯
ব্রিটিশ শাসন ও মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য ৫৬
সিপাহী বিদ্রোহ ও সেকালের বাঙালী ভদ্রলোক ৬১
বর্তমান সমাজ ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকবৃন্দ ৬৪
নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী শান্তিরঞ্জন ৭০
মার্কসবাদী সাহিত্যের পক্ষে ৭৩
সাহিত্যে মার্কসবাদী চেতনা ও 'মহেশ' ৭৯
রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সম্পর্ক ৮৪
ষোড়শী নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-ধারণা ৮৮
লেখকের জীবনদর্শন : শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ : অনুসঙ্গ ৯৬
শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার চাবি ১০৩
ছোটগল্প : দ্বিতীয় চিন্তা ১০৯
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : একটি সাক্ষাৎকার ১১৫
গণসাহিত্য প্রসঙ্গ ১২৩

…বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা আমি পরিদর্শন করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি নীল চাষের জমির নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে উন্নততর। নীলকরদের দ্বারা হয়তো সামান্য কিছু ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু সরকারী কিংবা বেসরকারী যত ইউরোপীয় এখানে আছেন তাঁহাদের যে কোনো অংশের তুলনায় নীলকর সাহেবগণ এই দেশের সাধারণ মানুষের অকল্যাণের চাইতে কল্যাণই বেশি করিয়াছেন।

ভারতপথিক রামমোহন রায়

আমি দেখিয়াছি নীলের চাষ এই দেশের জনসাধারণের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে; জমিদারগণের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষক জনতার বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যে অঞ্চলে নীলের চাষ নাই সেই অঞ্চলের তুলনায় নীলচাষের এলাকাভুক্ত অঞ্চলের মানুষ অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে। আমি ইহা কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই আমি ইহা বলিতেছি।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপর আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নই।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস বাস করিতেছি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Permanent Settlement-এর জন্যেই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত **middlemen** সমস্ত সমাজের **economic** অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি—কেবলমাত্র জমি আঁকড়ে থেকে কৃষকেরাই যা কিছু দেশের **wealth** সৃষ্টি করছে।…জমি কেনা ও বেশি সুদে লগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাংলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

কোনো মানুষই সমাজে থেকে সমাজের উর্ধ্বে বাস করতে পারে না। তার অর্থ প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণা স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যক্তি তথা পারিবারিক মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে।

দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক আয়তনের মধ্যে থেকে অজ্ঞাতসারেই শ্রেণীনির্বিশেষে সমস্ত স্তরেই আমাদের জীবনপ্রক্রিয়া ও দর্শনের জগতে সামাজিক বিন্যাসের ফলশ্রুতি দৃশ্যমান। কৌতূহলের বিষয় বিদেশী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছেঁড়া-খোঁড়া কিছু সংস্কারের উদ্যম দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও সামন্ত-তান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় উদাসীন সেজেছেন। বৃহত্তর জনসাধারণ রাষ্ট্রের নির্মম অত্যাচারে বহুবার উদ্বেল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সীমাবদ্ধ শক্তির কারণে অনিবার্যভাবেই তারা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কায়েমী স্বার্থচক্র ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের অজুহাতে নিয়মিত প্রচারবাদ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে: এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, নিষ্ক্রিয়, পরিবর্তনবিমুখ, রাজনীতি পরাঙ্মুখ এবং অদৃষ্টবাদী। স্পষ্টত এই সনাতন দার্শনিক বক্তব্যকে কাব্যে ভাষা দেন রবীন্দ্রনাথ 'ওরা কাজ করে'-জাতীয় পদ্যে। এবং একেই ভারতীয় জনমানসের চরিত্র বলে প্রচার করবার চেষ্টা হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীবিশেষের সুবিধা ও অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে অপরিবর্তনীয় রাখবার স্বার্থেই ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, দর্শনে, এই মনোভঙ্গি গড়ে ওঠে।

একটা সরল প্রশ্নের সরল উত্তর পাওয়া অসম্ভব হবে না। প্রশ্ন এই: এদেশ কী কৃষিপ্রধান নয়? উত্তর: অবশ্যই হ্যাঁ। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক চিন্তাটাও এইভাবে আসে যে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে বা বিপক্ষের নিরিখেই একমাত্র প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণীত হবে। ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের কল্যাণের জন্যে যে হয়নি এবং জমিদারি প্রথা যে প্রচণ্ডতম অন্যায়, এই সরল সত্য এদেশের আলোক-প্রাপ্ত মনীষীগণ বোঝেননি মনে করলে ওঁদেরি ধীশক্তির ওপর ভুল ধারণা করা হবে। আসলে এঁরা আইনসঙ্গত জমিদারি-নামক দস্যুতার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চুপ। রামমোহন শোনা যায় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা

স্পেনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের নিদারুণ সমর্থক ছিলেন অথচ স্বদেশে চাষিদের শোষণের পক্ষে নীলকর-অধিকৃত কৃষকদের উন্নতমানেয় অবস্থায় গদ্‌গদ্ হয়ে উঠেছিলেন। রামমোহন ব্যক্তিগত জীবনে কী ভূমিস্বার্থকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিলেন ? কিছু কিছু প্রগতিশীলের নিকট অধুনাপূজিত 'মানবতাবাদী' 'বিশ্বপ্রাণ' রবীন্দ্রনাথ 'দু বিঘা জমি'—পদ্যে জমিদারী শোষণের নির্মম চিত্র আঁকলেও বিবেকের তাড়নায় তিনি কী জমিদারি ত্যাগ করেছিলেন ? পর্যন্ত মার্কসবাদী জীবনীকারদের রচনায় খাজনা-আদায়কারী রবীন্দ্রনাথের মহানুভবতার সুবিধেবাদী রসালো গল্প শুনতে পাওয়া যায় !

এখানে অনেকেই সাফাই গাইবার সুরে বলবেন, ব্যক্তি ও শিল্পিসত্তার মধ্যে এই আপাতবিরোধ একটি সাধারণ নিয়ম। অবশ্যই এটাকে নিয়ম বলে মেনে নিতে পারলে অনেক গুরুতর জবাবদিহির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। জমিদারী চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে টলস্টয় নিয়ম-বহির্ভূত ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছেন !

আমরা এবার আমাদের অভীষ্ট স্থানে আসতে চাই। সেটা এই : কী-ব্যক্তিগত-কী-সমাজগত কী-রাষ্ট্রগত পরিকল্পনায় এই দ্বৈধ সত্তাকেই আমরা নিয়ম করে ফেলেছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : কথায় ও কাজে আত্মীয়তার বন্ধন নেই। যার তাৎপর্য শাদা বাঙলায় প্রচ্ছন্ন ভণ্ডামি। তাই এদেশে রাষ্ট্রচিন্তা সমাজচিন্তা ধর্মচিন্তা, সাহিত্য-শিল্প-শিক্ষায় চলেছে গোঁজামিলন, জোড়াতালি এবং পরিমাণে অনিবার্যত আমরা ধাবিত হচ্ছি সর্বনাশা অতল অন্ধকার গহ্বরে।

ধর্মীয় সংঘ ও ধর্মগুরুর সংখ্যা বিচারে এদেশকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক দেশ বলে স্বীকার করতেই হয়। স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত এটা ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই রাজনীতিকে তিনি ধর্মের প্রচ্ছদপট পরিয়ে ব্যবহার করে বহুলাংশে সার্থকও হয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম সাধনার দেশ আমাদের ভারতবর্ষ দেখতে দেখতে কী করে নিকৃষ্টতম নরকে পরিণত হল, সেটা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হওয়ার যোগ্য। খাদ্যে, ওষুধে বেবিফুডে, ধর্মে রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এমন শয়তানের কারখানায় কেমন করে উন্নীত হল, সেটাই চিন্তা করা প্রয়োজন। সামান্য উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় গান্ধীজির মাদকদ্রব্য বর্জনের সাধু সিদ্ধান্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে সরকার পৃষ্ঠপোষণায় কী-বিপরীত রূপ ধারণ করেছে কল্পনা করুন। আরো কল্পনা করুন পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে' সরকার বিরোধী মানুষকে শাসন করবার

জেলে প্রচলিত আইনকানুন যথেষ্ট নয়, বিনাবিচারে বিনাপরোয়ানায় বছরের পর বছর ধরে তাঁদের আটকে রাখা তো চলেই এমনকি অজুহাত তুলে জেলের মধ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। অনাবশ্যক জরুরি অবস্থা বজায় রাখতে হয়। অথচ 'খাদ্যে-ওষুধে–বেবিফুডে চোরাকারবারী ভেজালকারীদের জঘন্যতম অপরাধেও নাকি উপযুক্ত আইন তৈরি করা যায় না!

বুদ্ধদেব-চৈতন্য-নানক-মহাবীর-গান্ধীর পাশাপাশি চিত্রটা কীভাবে আপনি মেলাবেন?

এই সমাজসংগঠনের চেহারাটা বস্তুত লাস্কির ভাষায় এই রকম "a combination of privilege and gangsterism. একদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সামাজিক সুবিধে ও অধিকারের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার, অন্যদিকে এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে জনসাধারণের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া অনুগৃহীত কিছু ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী সৃষ্টি, যাদের একমাত্র কাজ শোষিত জনতার রোষ থেকে মুষ্টিমেয় অধিকারভোজীদের রক্ষা করা।

উপরিতলার এই সুবিধাখোর শ্রেণী একটা মাত্র মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। তা হচ্ছে ভয়। নিজেদের সুখসুবিধে হরণের দুশ্চিন্তা। শোষিত জনতার সচেতনতা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, বিপ্লব এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অদূর সম্ভাবনা। এবং এই সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখবার গরজে সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে চৌকিদারের ভূমিকায় নিযুক্ত করা। এই সংস্কৃতির নাম 'new commercial youth culture' বা নয়া বাণিজ্যিক যুব সংস্কৃতি। আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্যের পণ্যের মতো সারা ধনবাদী রাষ্ট্রে মড়কের আকার নিয়েছে। তার লক্ষণ আঁটোসাঁটো প্যাণ্ট, বেল্‌বটম্, সাইকেডেলিক শার্ট, ঝাঁকড়া বাবরি চুল, লম্বা জুলপি, জলদস্যু-সুলফ গোঁফ বিন্যাস, অভূতপূর্ব প্রগলভ পোশাক, মাদক বড়ি ইত্যাদি। চিন্তার বিষয়: এই অর্বাচীন দৃষ্টিমার্গ ও রুচি দিনের পর দিন সাবালক 'বয়স্কজীবনেও অনুপ্রবেশ করছে! একটি মাত্রই উদ্দেশ্য: মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা। আনন্দের বিকারকে জাগিয়ে তুলে প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিকিয়ে-রাখা।

সঠিক রোগনির্ণয় না হলে দামি ওষুধ প্রয়োগ যেমন ব্যর্থ হতে বাধ্য তেমনি এদেশে সত্যিকার যাঁরা মঙ্গল করতে চান তাঁদের এই জটিল সমাজ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে হবে। আসল সমস্যাকে এড়িয়ে আর কিছু করবার চেষ্টা সময়-কাটানোর একটা শ্রেষ্ঠ উপায় ছাড়া কিছু হবে না।

ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা

.........Thus it came about that the East India Company, formed in 1600, was much more than a trading company. Before the end of the seventeenth century it was given power, by an Act of the British Parliament, to send out ships of war, men, and ammunition for the security of its factories and places of trade, and to make war upon "any people that are not Christians (sic) in any places of their trade, as shall be for the most advantage and benefit of the said Governor and Company and of their trade." Gradually during this century the Company extended its territory, so that the monies it raised by the taxation of the native populations became a much more fruitful source of income than its trading profits. In a resolution adopted in 1688 the Company pointed out that "revenue" raised by taxation was certain "when twenty accidents may interrupt our trade." The Indian Crisis : Fenner Brockway.

এটি বিস্ময়ের কথা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, ইংরাজ আমলে এবং ইংরাজের শাসকের ভূমিকা থেকে বিদায় নেবার পরও, আজ পর্যন্ত, এমন মানুষের অভাব নেই যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সোনালী দিনগুলির জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন! বিদেশী প্রভুর এই অপূর্ব মাহাত্ম্য যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সওদাগরি রূপে এদেশের মাটিতে প্রথম প্রকটিত হল সেই দিন থেকে তার অন্ধ ভক্তজনকে রথের তলায় গড়াগড়ি দিতে দেখা গেল। ভারতপথিক রামমোহনই মূলত কোম্পানির হোমরা চোমরা সাহেব সুবোদের 'ব্যক্তিগত' রোজগার কিংবা বিলাসব্যসনের প্রয়োজনে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে কুসীদজীবীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এবং কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এই আর্থিক সহবাসের ফলে রামমোহন ১৮১৪-১৬ সাল থেকে বিরাট

বিরাট বাড়ি কিনে কলকাতায় স্থায়ী হয়ে বসে তৎকালীন বাঙালী 'ভদ্দরলোকদের' মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। ইংরাজদের অনুকরণে রামমোহনও সভা সমিতি গড়ে তুললেন। বড় বড় মজলিসে সাহেব সুবোদের খানাপিনা, 'নিকি' বাইজির নাচে তিনি দেদার টাকা খরচ করতে লাগলেন। অন্যদিকে চলল ধর্ম-সংস্কার, সমাজ–সংস্কারের কার্যাবলী। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই সকল সংস্কারমূলক কার্যাবলীতে সরকারের অনুমোদন ছিল। যেহেতু এই সকল 'সাধু' কাজে ইংরাজের ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থে আঘাত পড়েনি।

'নেটিভদের' মধ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষে রামমোহনের মতো ধনী ব্যক্তির সহযোগিতা ইংরাজদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হল। কারণ রামমোহন ভবিষ্যতের জন্যে ভারতের যে-পথ উন্মুক্ত করে দিলেন সেই পথের চিহ্ন ধরে আগামী কালের শাসকশ্রেণীর মজবুত 'ইতিহাস' তৈরি হল, যার সঙ্গে স্বভাবতই বৃহত্তর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

বলা বাহুল্য, রামমোহন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পুষ্ট 'নব্য জমিদার শ্রেণী', মধ্যস্বত্বভোগী এবং তারি আশ্রয়ে লালিত 'মধ্য শ্রেণী' গড়ে উঠল, যাঁরা দীর্ঘকাল, এবং আজো পর্যন্ত শ্রেণী-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাবৎ ভারতবর্ষের মানুষের স্বনির্বাচিত মুখপাত্র! এই 'মধ্য শ্রেণীই' ইংরাজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদেরি স্বার্থে তৈরি ইতিহাসের শবাধারটিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।

গ্রামে গাঁথা কৃষি ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মূলত কৃষক মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের বাইরে কেবল যুগে যুগে শোষণের জোয়ালটাকে এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে ফেলেছে, দুর্ভিক্ষ মহামারী মৃত্যুর শিকার হয়েছে, বিদ্রোহ করেছে, মার খেয়েছে। এ ব্যাপারে ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য মধ্য শ্রেণী ও শাসক শক্তির স্বার্থ মিলেমিশে তাদের চোখে এক হয়ে গেছে। মধ্য শ্রেণীর নেতৃত্ব ইংরাজের কাছ থেকে আরো অধিক শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধে দাবি করেছে, অথচ ঘুণাক্ষরে বিংশ শতকের ত্রিশ দশকের আগে পর্যন্ত এদের রাজনৈতিক পার্টি ঘৃণ্য জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের সামান্য প্রস্তাবও নিতে সক্ষম হয়নি।

বৃহত্তর মানুষের হাতে মধ্য শ্রেণীর এই 'ইতিহাসের' পতাকাটা ধরিয়ে দিয়ে এই সরণিতেই আমাদের মধ্য শ্রেণী অধ্যুষিত ঐতিহাসিকগণ আজো

পর্যন্ত ইতিহাসচর্চা করে চলেছেন। ফলে সত্যিকার জনগণাশ্রিত ইতিহাস আজো লেখা হল না। অবশ্য এর জন্য আমরা দুঃখ করিনা, কারণ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ইতিহাস সর্বদাই শাসকশ্রেণীর ইতিহাস!

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উনিশ শতকের ক্রমাগত কৃষক অভ্যুত্থান, সিপাহী যুদ্ধের মতো জনগণের 'ব্যাপক জাগরণ' কোনো কিছুই মধ্য শ্রেণীর কাছে আমল পায়নি। যেহেতু এই আন্দোলনগুলো সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে একযোগে আঘাত হানে। এর চেয়ে বরং ধর্ম ও সামাজিক নেতা সেজে সংস্কার পন্থী ঝোঁকগুলোকে কাজে লাগানো নিরাপদ। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ইংরিজি-মাধ্যম সহ চালিয়ে দেওয়াই ভালো।

কৌতুকের বিষয়, এই ইংরাজ-সহযোগী নেতৃবর্গ যখন ধর্ম-সমাজ-শিক্ষায় রেনেশাঁসের খোয়াব দেখছেন অন্য দিকে কৃষক বিক্ষোভ চলাকালীন রাম-মোহন সেখানেই তালুক কিনছেন, ইংরাজ সিভিলিয়ানদের সুদে টাকা দিচ্ছেন, বাবা রামকান্ত রায় ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন বাকি খাজনার দায়ে জেলে বন্দী থাকলেও বিত্তবান পুত্র টাকা দিয়ে তাঁদের মুক্ত করছেন না। রামকান্তের মৃত্যু হল। রামমোহন নানা কারণে পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকতে পারলেন না। বন্দী জগমোহনের কাতর প্রার্থনায় সুদ সমেত ফেরত পাবার কড়ারে রামমোহন তাঁকে এক হাজার টাকা কর্জ দেন। জগমোহন মেদিনীপুর জেল থেকে মুক্তি পান।

বিষয় আশয়ের প্রতি এই আসক্তি রামমোহনের ধর্মচর্চায় যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি তার কারণ সম্ভবত রামমোহন 'ধার্মিক' ছিলেন না, ধর্মান্দোলনকে তিনি সমাজ সংস্কারের অন্যতম বাহন মনে করতেন।

যেমন করতেন তাঁরি মন্ত্রশিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বিষয়বুদ্ধি ভ্রাতৃবধূ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উৎসাহিত করে। তাঁরি পাবনার জমিদারি থেকে বে-আইনি করের অত্যাচারে যখন কৃষকরা বিদ্রোহ করেন তখন দেবেন্দ্রনাথের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন জমিদারি স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে কৃষক বিক্ষোভকে "মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা" বলে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেন।

দৃষ্টান্ত না বাড়িয়েও স্বীকার করা ভালো এই হচ্ছে নব্য মধ্য শ্রেণীর চরিত্র। যার সঙ্গে বৃহত্তর দেশের মানুষের স্বার্থের কোনো যোগ নেই। এই শ্রেণীই প্রথমাবধি এদেশে ইংরাজ শাসনের মস্ত সমর্থক। এবং স্বীকার করে

নেওয়াই ভালো। উনিশশতকে বিশেষ করে বাঙালী মধ্যশ্রেণীই এই কৃতিত্বের অংশীদার। গান্ধীজি রাজনীতিতে প্রবেশ করবার আগে এই বাঙালী ভদ্দরলোকেদের রাজনীতিই সর্বভারতীয় 'মধ্য শ্রেণীর' রাজনীতির আকার ধারণ করেছিল।

ইংরাজ প্রভুত্ব আর এদেশে নেই, কাজেই নিরাবেগ ভাবে তাদের শাসনকালের একটা জমাখরচ নেওয়া যেতে পারে। ব্রিটিশ সমর্থকদের যুক্তিগুলি এই জাতীয় :

ক) এঁরাই প্রথম ভারতব্যাপী সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন

খ) রাজস্ব আদায়ের একটি আইনমাফিক ব্যবস্থা করা হল

গ) দেশরক্ষার ভার নিলেন তাঁরা

প্রশ্ন হচ্ছে: কার স্বার্থে? এর দ্বারা দেশের ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার কোনো মানোন্নয়ন হয়েছিল কি?

ভারতবর্ষের মানুষের পিঠে করের বোঝা চাপিয়ে যে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে তার ১/৩ ভাগ ব্রিটিশ ও ভারতীয় সিপাহীদের হাতি পোষার খরচে গেছে, ১/৪ ভাগ গেছে সিভিল সারভিসদের উদরে, যাদের বেশির ভাগ ছিল ব্রিটিশ-পুঙ্গব। ১ ১/৪ শিক্ষাখাতে, ১/৮ স্বাস্থ্য রক্ষায়, ১/১০ কৃষিকাজে এবং অন্যান্য গৌণ বিষয়ে।

ব্রিটিশ-শক্তির ভারতবর্ষে কোন্ স্বার্থ রক্ষার কাজ চলেছিল? ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থেই অন্যান্য বেনেদের মতো এদেশে ইংরাজদের পদার্পণ। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জিনিস কেনা বেচা ছাড়াও তাদের রোজগার বাড়াতে পেরেছিল ভারতীয় রাজন্যদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে করের মারফত। কোম্পানির সমুদয় রোজগার সরকারকে অর্পণ করা হয়।

পরবর্তী কালে এল ইংরাজ পুঁজির লগ্নি এবং ইংরাজ শাসকবর্গকে মাইনে দেবার ব্যবস্থা।

ফলত, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ তিন ধরনের স্বার্থরক্ষা করার ঢালাও সুযোগ পেল।

১. পুজি লগ্নি করবার ক্ষেত্র

২. ইংল্যাণ্ডে তৈরি জিনিসের বাজার

৩. শাসকবর্গকে মাইনে দেবার জন্য রোজগারের পথ

১৯২৭-২৮ সালে ইংল্যাণ্ডে তৈরি জিনিসের আমদানি এবং ভারতবর্ষের জিনিসের রপ্তানির গড় হচ্ছে যথাক্রমে ৯০,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ব্রিটিশ দ্রব্যের এদেশের বাজার দখল করার হিসেব অবশ্যই প্রভুদের অনুকূলেই যায়।

দ্বিতীয়ত, শাসকবর্গের খরচ জোগাতে ভারতবর্ষের রাজস্বের ১/৩ অংশ শুষে নেওয়া হয়। তার পরিমাণ মোটামুটি বার্ষিক ৩২, ৮০০,০০০ পাউণ্ড।

বেতনের চেহারাটা একবার লক্ষ্য করা যাক :

ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল	১৯,০০০ পাউণ্ড
সেনাবাহিনীর প্রধান	৭,৪০০ ”
গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সভ্য	৬,০০০ ”
দশটি প্রাদেশিক গভর্নর	৪,৯০০ থেকে ৯,০০০ ”
প্রধান বিচারপতি (কলিকাতা)	৫,৩০০ ”

এই শাসকবর্গের খরচ জোগাতে বেতন হিসেবেই ভারতবর্ষ থেকে যায় বছরে ১,২২০,০০০ পাউণ্ড।

এছাড়াও রয়েছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের জন্যে খরচ ৩৬৫,৮০০ পাউণ্ড, তার মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দিত ১৩৬,০০০ পাউণ্ড, বাকিটা ভারতবর্ষ থেকে যেত।

সেনাবাহিনীর মোট খরচ বছরে ৪৩,৭৬১,০০০ পাউণ্ড। স্মরণ রাখা উচিত যে সেনাবাহিনীর ১/৩ অংশ ব্রিটিশ। ব্রিটিশ সৈন্য ভারতীয় সৈন্যের অপেক্ষা চারগুণ বেশি পেত। ব্রিটিশ সেনা অফিসার ভারতীয় অফিসার থেকে ছয়গুণ বেশি।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ভারত শাসনের ভার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ওপর এলে অবস্থার উন্নতি হয়েছে!

কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড এলেনবরো, লর্ড ডালহৌসির আমলে শাসনযন্ত্রের যে চেহারা প্রত্যক্ষ করা গেছে তা কোম্পানির শাসনের থেকেও জঘন্য।

কোম্পানির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার শুরু করল আফগান যুদ্ধ। পরিণামে আফগানের আক্রমণে, ঠাণ্ডায়, ক্ষুধায় ১৬,০০০ সৈন্য ধ্বংস হল। মিত্র

রাজ্য সিন্ধু জয়ও ষড়যন্ত্রমূলক। পাঞ্জাব-অধিকারও এই জাতীয় ঘটনা। বার্মা অধিকার করা হল যেহেতু ইংরাজ বণিকদের ওপর কর ধার্য করা হয়েছিল।

সবচেয়ে নিন্দার্হ কাজ উত্তরাধিকারের অভাবে রাজন্যবর্গের দত্তক নেবার অধিকারকে কেড়ে নিয়ে সেসব রাজ্য দখল করা। সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর এবং আরো ছোট খাটো রাজ্য এইভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসে আহুতি দিল।

নানাভাবে আদায়ীকৃত ভারতের এই রাজস্ব ব্রিটিশ কোথায় কোথায় নিযুক্ত করল? তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার ভারতবর্ষের বাইরে ব্রিটিশের যুদ্ধ অভিযানের খরচও এই হতভাগ্য দেশকে বহন করতে হয়েছে। যেমন ইজিপ্ট-আবিসিনিয়া, আফগানিস্তান ও বার্মার যুদ্ধ। এই-ভাবে ভারতের রাজস্বের ⅓ অংশ সেনাবাহিনীর পেছনে ব্যয় হয়েছে।

হাসান ইমাম ১৯১৮-তে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে যে তীব্র মন্তব্য করেন ইতিহাসের প্রয়োজনে তার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার টানছি।

"The apologists of British Rule in India have asserted that the presence of the British in this land has been due to humane motives; that the British object has been to save the Indian peoples from themselves; to raise their moral standard, to bring them material prosperity, to confer on them the civlising influences of Europe, and so forth and so on. The fact is that the East India Company was not conceived for the benefit of India, but to take away her wealth for the benefit of Britain. The greed of wealth that characterised its doings was aecompanied by greed for territorial possession, and when the transference of rule from the Company to the crown took place, the greed of wealth and the lust of power abated not one jolt in the inheritors, the only difference being that tyranny became systematised and plunder scientific."

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ইংরাজি শিক্ষা

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র এক শ্রেণী দ্বারা আরেক শ্রেণীকে দাবিয়ে-রাখার যন্ত্র বিশেষ। শাসকশ্রেণী শুধুমাত্র শাসন পদ্ধতি তৈরি করে নিশ্চিন্ত থাকে না। এ-শাসকগোষ্ঠী যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ হয় তাহলে তার রাজত্বকে দৃঢ়মূল করতে উপনিবেশেও স্থানীয় লোকেদের মধ্যে তাকে সমর্থক ও সহযোগী খুঁজতে হয়। যারা আদি থেকেই সাম্রাজ্যবাদ প্রসাদপুষ্ট সুবিধেভোগী হয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদের চিত্তগুণের পঞ্চমুখ প্রশংসা জুড়ে দেবে।

এই সহযোগী শ্রেণী যত পুষ্ট হবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মস্ত সহায়ক হবে। কালক্রমে স্থানীয় সহযোগীদের মূল্যবান সৌহার্দ্যেই সাম্রাজ্যবাদকে নিজের দেশ থেকে লোক এনে শাসন চালনার বাড়তি ধকল সইতে হবে না।

এই উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেরেস্তাদার বা মুনশীকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করবার কালে তার সঙ্গেই জমিদারি সূত্রে গাঁটছড়া বাঁধা হল। জমি রাজস্বের আয়ই এদেশে ব্রিটিশের প্রথম পুঁজি, ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন। এই লুণ্ঠনের চিরস্থায়ী ঠিকে নিল জমিদার শ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার একটি জবরদস্ত ঘাঁটি হল জমিদার, যারা জমিদারি শেকলের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের শেকলকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে নিল। দুটি স্বার্থ একই সূত্রে জড়িত হওয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে কোনোটিরও বিচার করা সম্ভব নয়।

ব্রিটিশের দ্বিতীয় কাজ হল, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পাহারাদার হিসেবে এদেশে একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্র তৈরি করা যারা কেরিয়ার তৈরির যূপ-কাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত এবং দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, জনবিরোধী, অন্ধ, নিষ্ঠুর যন্ত্র বিশেষ।

তৃতীয় কাজ হল, শাসক গোষ্ঠীর ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সম্ভব হলে ধর্মে, কালা চামড়ার 'ইংরাজ' তৈরি করা। যারা জমিদার নয়, তথাকথিত 'মধ্য শ্রেণী'।

কাজেই এটা একটা পরম সত্য যে, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, আচার আচরণ, সংস্কৃতির 'স্বাধীন' কোনো অস্তিত্ব নেই। তা শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষারই বিভিন্ন দপ্তর।

সাম্রাজ্যবাদকে মজবুত করবার অভিপ্রায়ে এসব কাজে হাত দিতে ব্রিটিশের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সেরেস্তাদার-মুনশী জমিদার চক্রের প্রভুভক্তি জন্মকাল থেকেই, বিশেষ করে বাঙালী সুবিধেভোগী শ্রেণীর মধ্যে, অপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ প্রীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। বস্তুত কোনো ঔপনিবেশিক গোলামই এমন করে বিদেশী প্রভুকে এই ধরনের ভালোবাসেনি !

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যখন এদেশে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করবার প্রয়োজন দেখা দিল তখন রামমোহন রায় বিদেশী শিক্ষার প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এলেন। উল্লেখযোগ্য, এই রামমোহনই মুসলমান আমলে তৎকালীন সরকারি ভাষা ফার্সী শিখেছিলেন।

শাসকগোষ্ঠীর বদলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইংরাজি ভাষার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

মেকলে সেদিন যে আশা পোষণ করেছিলেন ভারতীয়ের মধ্যে কালা-চামড়ার সাহেব তৈরি করবার, যাঁরা আচারে–আচরণে ইংরিজিয়ানায় বুঁদ হয়ে ক্রমে নীচু তলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবেন। এটাই মেকলের **infiltration theory**. কাজেই ইংরাজি শিক্ষার প্রয়াস সীমাবদ্ধ রইল উচ্চশিক্ষার মধ্যে, পল্লী অঞ্চল থেকে দূরে কতিপয় শহরে মধ্য শ্রেণীর চৌহদ্দিতে। প্রাথমিক শিক্ষার দিকে ব্রিটিশের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। কারণ 'ছোটলোকদের' মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঝুঁকি অনেক। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবে শহুরে ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী তাদেরি শ্রেণীস্বার্থকে নিরাপদ করবার প্রয়োজনে।

ইংরাজি শিক্ষার পাথরটা ইংলণ্ডের ছাঁচে হুবহু আমাদের সমাজদেহে বসিয়ে দেওয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ-ইস্কুলের মজবুত অট্টালিকা গড়ে উঠল। আনুষঙ্গিক দামি সরঞ্জাম পৌঁছে গেল। শিক্ষার মাধ্যম বিদেশীভাষা নির্দিষ্ট হল, পাঠ্যসূচী, পঠন পাঠনের কৌশল ইত্যাদির সমাবেশে এক রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল।

এদেশে ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগানে যাঁরা পঞ্চমুখ তাঁদের কাছে সবিনয়ে একটি প্রশ্নই রাখতে চাই, এই শিক্ষার কি ফলশ্রুতি আমাদের ওপর বর্তেছে ? একটা কাজের ভালোমন্দ বিচার হবে তার ফলের ওপর। আমাদের তো মনে হয় সাম্রাজ্যবাদ যে-উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরাজি চাপিয়ে

দিয়েছিল তার সে-উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। অর্থাৎ বৃহত্তর দেশের মানুষের সম্পর্ক রহিত শহুরে শিক্ষিত (?) মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব, যাদের হাতে নিশ্চিন্তে একদা ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে। ইংরাজি শিক্ষা সার্থক ভাবে আমাদের নিজস্ব অবস্থান, পরিবেশ, প্রয়োজনকে ভুলিয়ে দিয়ে ধার-করা ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গিকে আলগাভাবে চাপিয়ে দিল। আমাদের দেশজ যা কিছু মূল্যবান উত্তরাধিকার ছিল সবকিছু নস্যাৎ করতে শিখে আমরা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যকেই বড় করে দেখলাম। এবং একজন নিষ্ঠাবান 'ভারতীয় প্রজা' হিসাবে এ দেশের সমস্যাকে বুঝতে ও সমাধান করতে প্রয়াসী হলাম। আমরা এসকল ধারণা পোষণ করলাম যে, ইংরাজ আমাদের 'জাতীয়তা-বোধ' 'দেশপ্রেম' ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথম শিক্ষিত করল। এবং এই ধারণায় বুঁদ হয়ে দেশের আসল চেহারা—বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, শ্রেণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ধামাচাপা দিয়ে সদ্যোজাগ্রত মধ্যশ্রেণীর শাসক-শ্রেণীতে উন্নীত হবার স্বপ্ন দেখতে শিখলাম।

আমাদের 'জাতীয়তাবোধের' একটি চমৎকৃত দৃষ্টান্ত এই : সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ১৮৫৭-এর মূলত কৃষক-সংশ্লিষ্ট প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে কলংকিত করলামই শুধু নয়, বাঙালী বুদ্ধিজীবী তার তাৎপর্যকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করল। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' আমাদের ছাত্রেরা আজো পর্যন্ত ঘটনাটিকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে মুখস্থ করছে। এই ইতিহাসই সিরাজদৌল্লাকে নৃশংস সাজিয়েছে, প্রতাপ রায়কে নির্মম বানিয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কল্যাণকর এঁকেছে, ক্যানিংকে 'দয়ালু' বলতে শিখিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কৌতুকের বিষয় আমরা এ সকলকে সত্য মেনে পরীক্ষায় পাশ করেছি।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম ইংরাজি শিক্ষার সাম্রাজ্যবাদী বদমায়েশির মুখোশ উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা হল। নেতৃত্ব এ দেশের প্রয়োজনে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করবার কথা চিন্তা করলেন। এই 'জাতীয় শিক্ষার' কল্পনা মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা-দোষে-দুষ্ট হলেও এই উদ্‌ঘাটনের একটা মূল্য আছে।

এ কথাটা পরিষ্কার করে বোঝবার গুরুত্ব রয়েছে যে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব দীর্ঘকাল আমাদের সাম্রাজ্যবাদ অনুরাগী করে রেখেছে। আমাদের স্বাধীনতাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব, আইরিশ

বিপ্লব, রাশিয়ান বিপ্লব—ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে এ-দীক্ষা আমরা কোনোকালেই গ্রহণ করিনি।

অথচ বারবার আমরা ব্রিটিশের কাছে আবেদনের থলি নিয়ে এগিয়েছি, তাদের চিত্তের ঔদার্যের নিকটে অনুরোধ জানিয়েছি। যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব ঔপনিবেশিকদের ক্ষেত্রে প্রধান।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইংরাজের সহনশীলতা গুণের যখন নির্জলা প্রশংসা করতে উদ্যত হন তখন আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশে ব্রিটিশের উলঙ্গ বর্বরতার কথা ভুলে যান। ভারতবর্ষে তুলনায় সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা যদি কম হয়ে থাকে তা তার ঔদার্য নয়, তার কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদরে পুষ্ট প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদ অনুরাগী শ্রেণীর সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের স্বর্নূর্তিতে উদগ্র হবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। জাগ্রত মধ্য শ্রেণীর এই passivity-ই সাম্রাজ্যবাদকে দীর্ঘকাল এদেশে নিরাপদ করেছে। 'সিপাহী বিদ্রোহকে' দমন করবার জন্যে ইংরাজ সেকালে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে সেই স্মৃতিকে ভুলতে গিয়ে আমরা ক্যানিংকে 'দয়ালু' বানিয়েছি। বুঝিনি ক্যানিংয়ের এই 'দয়া' সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অন্য কৌশল মাত্র।

ইংরাজি শিক্ষা প্রসঙ্গে যে য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতার কথা ওঠে সেটা বিশেষ করে সমগ্র য়ুরোপেরই দান, তজ্জন্য একক গৌরব ইংরাজের প্রাপ্য নয়। ইংরাজ ছাড়া ফরাসি কি জর্মান, যে কেউ হলেও বিষয়টা একই হত। ইংরাজের জানালা দিয়ে আমরা বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর এতাদৃশ অচলা ভক্তিও আমাদের মেরুদণ্ডহীনতার প্রমাণ। ইংরাজ-রাজত্ব এদেশে পঞ্চবার্ষিক দুর্ভিক্ষেরই অন্যনাম, কখনোই প্রগতিশীল ভূমিকা বহন করে আসেনি। ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার মাত্র। শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত ইংলণ্ডে হতে পারে, প্রধানত ভারতবর্ষই তার প্রণামী জুগিয়েছে এও তেমনি সত্য। কাজেই শিল্প বিপ্লবের 'ফলশ্রুতি এদেশে কোনো অর্থ-নৈতিক বিপ্লবেরই তাগিদ দেয়নি বা উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীরও সৃষ্টি করেনি। বস্তুত ব্রিটিশের সহবাসে উনিশ শতকে যে-রেনেশাঁসের প্রচার আমরা করি তা সাম্রাজ্যবাদ সহযোগী শহুরে মধ্য শ্রেণীরই নকল রেনেশাঁস যা য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের মতো কোনো গুণগত পরিবর্তনও সূচিত করেনা। তা বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদ পৃষ্টপোষণা পুষ্ট ধর্ম বা সমাজ-সংস্কারের কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক চিন্তার কোনো আলো সেখানে বিকীর্ণ হয়নি। কারণ ততদিনে

এই প্রধান রেনেশাঁসওয়ালারা শাসনে ও শোষণে ইংরাজের জুনিয়ার পার্টনার হয়ে গেছে।

দৃষ্টান্ত দিয়ে কেউ কেউ বলবেন, ইংরাজি সাহিত্যের মধ্যে আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আস্বাদ পেয়েছি। এটা বিশ্বাসের কথা, সত্যের কথা নয়। ইংরাজি সাহিত্যের মতো বিশ্বে জার্মান সাহিত্য আছে ফরাসি সাহিত্যও আছে, (গ্রীক সাহিত্য কোনো দেশের পৈতৃক সম্পত্তি নয় আশা করি) এবং কোনেটিই কারুর তুলনায় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়! সাহিত্যে এলিজাবেথ বা ভিক্টোরিয়ার যুগকে আমরা পরীক্ষা পাশের জন্যে পড়েছি, ইস্কুলে বা কলেজের পাঠ্যপুস্তকে আমাদের সাহিত্যবোধ কখনোই জাগেনি। শেকসপীয়র-মিলটন-বায়রন সম্পর্কে আমাদের বিদ্যা অ্যাকাডেমিক মাত্র। তৎকালীন সমাজে এইসব লেখক সম্পর্কে বস্তুগত বিচারের শিক্ষা আমরা ইস্কুল-কলেজে পাইনি, তা আমাদের ব্যক্তিগত সমাজদৃষ্টি ও অধ্যয়নেরই ফল। আমাদের সাহিত্যিকেরা অন্ধের মতো ইংরাজি সাহিত্যকে মকশো করেছেন এবং আজো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষ্য মানলে, ভিক্টোরিয়ার যুগকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। সাহিত্যবোধের নামে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার চশমাকেই নাকে চাপিয়েছি। ফলত আমাদের সাহিত্য মূলত কলোনিয়াল সাহিত্য ছাড়া কিছু নয়। শেলী বা বায়রনের সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমাবেগ আমাদের এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তাঁদের র‍্যাডিকাল চিন্তা ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে আবরণ দেওয়া হয়েছে। সনাতনী ওআর্ডস্বার্থকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

হ্যাঁ, ইংরাজ আমাদের বিশ্বসাহিত্যের জানালা খুলে দিয়েছে, কিন্তু সে-সাহিত্য সেনসর্‌ড, কনট্রোল্‌ড, যেন সাম্রাজ্যবাদী নোংরা দাঁতটা না প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ইংরাজ পরম অনুগ্রহে যা পাঠিয়েছে তাই আমরা চর্বিত-চর্বণ করে কৃতজ্ঞতার ঢেকুর তুলেছি।

আর, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের দানের কথা? আজো পর্যন্ত আমাদের দেশে বিদেশী যন্ত্রপাতি এসেম্বল করে' মেড ইন ইণ্ডিয়ার ছাপ মারতে হয়। বেসিক্ কেমিকেলস-এর জন্যে বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হয়।

আমাদের বিজ্ঞানীদের স্বাধীন গবেষণার ক্ষেত্রে পদে পদে ইংরাজ প্রভু আমাদের বাধাই দিয়েছে। জগদীশ বসু বা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভার কী-অপব্যবহার হয়েছে বিচার করলেই ধরা পড়বে।

আর ইংরাজের অনুগ্রহে আমাদের রাজনীতি চেতনা যে কী-পরিমাণ অন্ধ তর্জমা, আজো পর্যন্ত দেশের হাল যা হয়েছে সেটাই চরম দৃষ্টান্ত। অবশ্য, স্বীকার করতেই হবে এই রাজনীতি চেতনা ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর রাজনীতি যা তাকে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী চরিত্রে উন্নীত করে ভবিষ্যতের শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত করেছে।

দৃষ্টান্ত না-বাড়িয়ে এখন এই সিদ্ধান্তে আসা যায় এদেশে ইংরাজি শিক্ষাপদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদেরই দোসর। স্বাধীনতা-স্পৃহার জন্ম ইংরাজিয়ানাকে অস্বীকার করেই।

কোনো সাম্রাজ্যবাদই তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে উপনিবেশের মানুষের হাতে তার মৃত্যুবাণ তুলে দিতে পারেনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও তাই কোন ব্যতিক্রম নয়।

সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে

বাঙলা দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বাগ্রে অনুধাবন করার প্রয়োজন। পাঁচ শতকে গুপ্ত যুগ থেকে এ দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে। যথারীতি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যদিকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী আন্দোলনে। তার নাম বৌদ্ধধর্মই হোক, বৈষ্ণবধর্মই হোক কিংবা ইসলামধর্মই হোক।

পরিবর্তিত পটক্ষেপে এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই আবার মুঘল শাসনে দরবারে যেমন উচ্চপদ গ্রহণ করেছে তেমনি হিন্দু বেনিয়া শ্রেণী সরকারের ফিনানসিয়ার হিসাবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের লগ্নিদার হিসাবে প্রচুর প্রভাব খাটিয়েছে।

সতেরো শতকের তুর্কী-আফগান ইসলামী আমলে, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এতাবৎকাল অবহেলায় স্থানীয় নিম্নবর্ণের জনসাধারণ মুক্তির আশায়, বিশেষ করে বিস্তৃত পূর্ব বাঙলায়, দলে দলে ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইসলামধর্মকে আলিঙ্গন করল। কিন্তু তথাকথিত তুর্কী-আফগান অভিজাত শ্রেণীর ব্যবহার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চেয়ে কিছু বিপরীত হলনা।

শাসক পার্টির শ্রেণী চরিত্রের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান একীভূত হয়ে তাদের শ্রেণীগত ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করেছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে তখন এই বাঙলাদেশ সমৃদ্ধির চূড়ায় স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের রাজসভার প্রধান চিকিৎসক ভিনিশ, মানুচীর সাক্ষ্য : **"All things are in plenty here, fruits, pulse, grain, muslins, cloths of gold and silk."**

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁর আমল বাঙলাদেশের গৌরবময় যুগ।

কিছু ভূম্যধিকারী ও 'বানিয়া' হিন্দুদের যোগসাজসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথাকথিত "পলাশীর যুদ্ধ" নামক যে ঘটনাটি ঘটালেন তা

আসলে, কে. এম. পানিক্কারের ভাষায় "a transaction not a battle, a transaction by which the compradors of Bengal led by Jagath Seth sold the Nawab to the East India Company." পরবর্তীকালে ভারতীয় শাসক শ্রেণী যে-ভূমিকা নেবে তারই ঐতিহাসিক ইঙ্গিত কী এই ঘটনার মধ্যে নিহিত নেই? শাসক হিসেবে ব্রিটিশের নিশ্চিত পদপাত যে তাদের দূরদৃষ্টিতে ছিল এই ঘটনা এবং যখনি যে শাসক এসেছে তারই সহযোগী শ্রেণী হিসাবে এদের গাঁটছড়া বন্ধন. আরেকটি সত্য উদ্ভাসিত করে যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এই শ্রেণীর আত্যন্তিক শ্রদ্ধা-প্রীতি-আস্থা তাবৎ উচ্চবিত্ত মানসকে আপ্লুত করে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এই জাতীয় নিঃশর্ত ভালোবাসা বিশ্বের ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত কোনো মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রে নেই! এ-বিশেষত্ব সম্পূর্ণ-"ভারতীয়"।

ভূমিরাজস্বকে পাকাপাকি ঔপনিবেশিক শোষণের জোয়ালে বেঁধে নেবার স্বার্থে, প্রাচীন সামন্ত প্রথাকে নবীকরণের গরজে এবং মুহুর্মুহু কৃষকদের বিক্ষেভের বিরুদ্ধে এমন একটি জমিদার শ্রেণী গড়ে তোলবার জরুরি প্রয়োজন, যারা কৃষকদের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে, তথা ব্রিটিশ-প্রদত্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় স্থিত হয়ে ইংরাজপ্রভুকে লুঠের ভাগ দেবে!

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই ব্যবস্থা।

১৮২৮-এ গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের মন্তব্য: "If security was wanting against populas tumult or revolution, I should say that the Permanent Settlement, though failure in many other respects and in most essentials, has this great advantage at least of having created a vast body of rich landed proprieters deeply intrested in the continuance of the British Dominion and having complete command over the mass of the people."

মুঘল আমলে যে মুসলিম ভূস্বামী তথা রাজস্ব আদায়-কর্তারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের সৌভাগ্যের দিন অস্ত হল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চাকরি ও নানাবিধ সূত্রে যে হিন্দু বিত্তশালী সম্প্রদায় বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন তাঁরাই এই নতুন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে "নতুন জমিদারে" পরিণত হলেন। অর্থাৎ হিন্দু উচ্চবর্ণ শ্রেণী—ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-ক্ষত্রিয়।

এই ভূস্বামী স্বার্থ বিজড়িত মধ্য শ্রেণীই উনিশ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাম্পিয়ান হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে আড়াল করে ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতা-শাসন-বিচার-পদ্ধতি যাবতীয় বস্তুর "অনুগত ভারতীয় প্রজা" হিসাবে পরম সমর্থক হয়ে উঠল। বিচিত্র কী, মুঘল-শাসনে "ফার্সী" সরকারিভাষা হওয়ায় সেদিন এরাই সরকারি চাকরি কবজা করতে ছুটে গিয়েছিলেন। সেই সুবাদে এঁরা "ইংরাজি" ভাষারও প্রচণ্ড সমর্থক।

রামমোহন রায় কৃতজ্ঞতা জানালেন এই ভাষায়: "Indians are fortunately placed by providence under the protection of the whole British Nation, or that king of England and his Lords of Commons are their Legislators, and that they are secured in the enjoyment of the sa ne civil and religious privlieges that every Briton is entitled to in England." খ্রীশ্চান জনসাধারণের নিকট আবেদনে তিনি আরো জানালেন "the Supreme Disposer of the universe for having unexpectedly deliverd this country, from the long continued tyranny of its former Rulers, placed it under the Government of the English." ইত্যাদি।

শাসক চরিত্রের বদলের সঙ্গে সঙ্গে এধরনের আনুগত্যের বদল এ দেশীয় সহযোগী শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভবপর। অবশ্যই ব্রিটিশ শাসনের এই কল্যাণকারী ভূমিকায় গদ্‌গদ হয়ে-ওঠা রামমোহনের পক্ষেই স্বাভাবিক, কারণ এঁরাই সর্বাগ্রে শাসকের কাছে প্রভুভক্তির পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ববর্তী মুসলিম শাসন রামমোহনের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বার্থে কী পরিমাণ ঘা দিয়েছে পুরোপুরি জানা না-থাকলেও রামমোহন ফার্সী শিখেছিলেন তদানীন্তন সরকারি চাকরির সুবিধে গ্রহণ করবার জন্যেই। এবং সবচেয়ে কৌতূহলের, রামমোহনের যে শির "রাজা" খেতাবে মণ্ডিত তাও মুঘল সম্রাটের অনুগ্রহে প্রাপ্ত।

এবার গোটা পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। উনিশ শতকে মুসলিম মধ্যশ্রেণীর দুর্বলতা আমাদের ইতিহাসে গভীর স্বাক্ষর ফেলল। লখনৌ, দিল্লি, লাহোর, এই মুসলিম কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি যখন অন্ধকারে ডুবছে তখন ব্রিটিশ কেন্দ্র—কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ আলোর রোশনাইয়ে

ঝলমল করে উঠেছে। সরকারি সহযোগিতার দক্ষিণহস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিকে প্রসারিত হয়েছে—চাকরি, নানাবিধ বৃত্তি এবং স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্যে হিন্দুরা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে।

এই অর্থনৈতিক তারতম্য দুই প্রধান সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন প্রকট হয়ে উঠল যে, ১৮৭০ থেকে তথাকথিত "সাম্প্রদায়িক সমস্যা"-কে সুযোগ মতো ব্যবহার করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠল। এই "ভাগ করো এবং শাসন করো" নীতি ইংরাজের আয়ুষ্কাল এদেশে প্রলম্বিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদের ভাষায় **"Communalism needs only to be well started and then it thrives of itself."**

ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই যে কাঁটা বিদ্ধ হল তাতে ইসলামী শাসনে সুবিধাভোগী অভিজাত মুসলমান এবং সংখ্যাগুরু দরিদ্র মুসলিম চাষিসমাজ এই বিদেশী শাসককে ও সহযোগী উপরতলার হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং তাদের অনন্ত দুর্দশার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণরূপে গণ্য করেছেন।

আমাদের বিশ শতকের ত্রিশ দশকের আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে ঘৃণিত জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ মারফত রায়তদের, বিশেষ করে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের রক্ষার্থে কোনো প্রস্তাবই নেওয়া হয়নি।

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে উপরতলার হিন্দুদের প্রাধান্য থাকার কারণেই দীর্ঘদিন এমন ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।

কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী ও সুরেশ বাঁড়ুজ্যের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রথম দিকে কৃষকদের স্বার্থ ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও জোড়াসাঁকো কবলিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বরাবর ই জমিদারি স্বার্থেরই পোষণ করেছে। পরবর্তীকালে হিউম সাহেবের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্ম হলেও স্মরণ রাখতে হবে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই তা গঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুযায়ী একটি বিরোধী পক্ষ সৃষ্টি করা। অস্থির জনতা ও সরকারের একগুঁয়েমির মাঝখানে একটি সেফ্‌টিভালভ্‌ তৈরি করা। উল্লেখযোগ্য, সুরেন বাঁড়ুজ্যের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নীতির সঙ্গে এই 'সদ্যোজাত কংগ্রেসের' কোনো মিল ছিলনা। স্বাভাবিক কারণে কংগ্রেসের জন্মলগ্নে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের

নেতাদের আহ্বান আসেনি। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় প্রস্তুতির জন্যে যখন হিউম এসে দেখলেন বাঙলাদেশে এই জনপ্রিয় নেতাদের বাদ দিয়ে কিছু করবারই উপায় নেই তখন বাধ্য হয়ে নেতাদের সাহায্য নিতে হল।

কিন্তু কংগ্রেসের কাজ সম্বৎসরে কয়েক দিনের উৎসব জাতীয় কার্যকলাপে সীমাবদ্ধ রইল। অশ্বিনী দত্ত পরিহাস করে যার নাম দিয়েছিলেন 'তিনদিনের তামাশা'।

ইতিমধ্যে শ্রেণীস্বার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভূস্বামী এবং সরকারী পদমর্যাদায় যুক্ত উচ্চ মধ্যশ্রেণীর হিন্দুরা হিন্দু পুনর্জাগৃতির স্বপ্নে এমন বিভোর হয়ে গেলেন যে, ধর্ম-রাজনীতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। বৃহত্তর স্বাধীনতার আন্দোলনের বাতাবরণ পর্যন্ত এই ধর্মের ধূপধুনোর গন্ধে অন্ধকার হয়ে এল।

১৯০৫—১৯১১ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠল তাতে করে দুই প্রধান সম্প্রদায়কে সামিল করবার সুযোগ এসেছিল। দেখা গেল ঢাকার প্রতিক্রিয়াশীল নবাব ছাড়া অন্য মুসলিম নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁদের রায় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল রসুল, ময়মনসিংহের আবদুল হালিম গজনভি, বর্ধমানের আবদুল কাসেম এবং লিয়াকত হোসেন প্রমুখ। এমন কী আলিগড় মুসলিম কলেজের সম্পাদক মোহসীন-উল-মুল্ক জানাচ্ছেন, তরুণ ছাত্রেরা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাদের আটকে রাখা যাচ্ছেনা। উপরন্তু বিদেশী বস্ত্র বর্জনের পক্ষে এই স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম তাঁতীরা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ, সুরেন বাঁড়ুজ্যেকে বাদ দিলে, আন্দোলনের এই সেকুলার চেহারাটিকে ধরতে চেষ্টা করলেন না। হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার এমন একটা আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হয়ে উঠল যে বঙ্গভঙ্গের ঘোষিত দিন ১৫ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে শুরু হয়ে গেল রাখীবন্ধনের ধুম, হিন্দুরা ঘটা করে গঙ্গাস্নানে পবিত্র হলেন, কালীমূর্তির সামনে শপথ নিলেন, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হল।

জাতীয় আন্দোলনে এ জাতীয় ধর্মীয় সংস্কার অন্য সম্প্রদায়ের আবেগকে বাধা দেবে কি না এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা হিন্দু নেতাদের মনেও এলনা। যদিও বরিশালে মুসলিম জনসাধারণ এই স্বদেশী জোয়ারে যোগ দিয়ে গণ সঙ্গীতে এবং হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে "বন্দেমাতরম্" "আল্লাহো আকবর"

ধ্বনিতে পরিস্থিতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তাহলেও এটি স্থানীয় ঘটনা।

এই আন্দোলনের দুর্বলতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বাভাবিক ভাবে কাজে লাগাল। ১৯০৬ এর ৩০ ডিসেম্বর আগা খান ও ঢাকার নবাব সালিমুল্লা খানের নেতৃত্বে জন্ম নিল মুসলিম লীগ। লীগ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ঘোষণা করল: এতদ্দ্বারা মুসলিম জনসাধারণের মঙ্গল হবে, কাজেই মুসলমানরা বয়কট আন্দোলন বন্ধ করুন।

পূর্ববঙ্গে স্বদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বানানো হল। কুমিল্লা ও জামালপুরে সাম্প্রদায়িক দাংগার আগুন জ্বলে উঠল। ভাইসরয় লর্ড মিনটো এই সাম্প্রদায়িকতায় উল্লসিত হয়ে মন্তব্য করলেন **"they will be a useful reminder to the people in England that the Bengali is not everybody in India, in fact the Mohammedan Community, when roused, would be a much stronger and more dangerous factor to deal with than the Bengalis."**

যাই হোক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙলা দেশকে ছাপিয়ে সর্বভারতীয় জনমতে বিস্তীর্ণ হলে এবং বাঙলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচণ্ড গতিবেগে ইংরাজ আতংকিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯১১তে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার কাঁটা সমানে বিঁধেই রইল। এই আন্দোলন সার্বিক মুসলিম জনসাধারণের উপর কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারল না।

এই বিষয়টি অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন রয়েছে যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য আছে। হিন্দু জমিদারদের স্বার্থ ছিল পূর্ববাঙলার জমিদারির অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখা। বঙ্গ বিভাগ হয়ে গেলে তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি হত। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু মুসলমান প্রজাদের স্বার্থ জমিদারের সংখ্যাতীত বেআইনী করের হাত থেকে কিছু স্বস্তি পাওয়া। একথা ঠিক জমিদার হিসাবে মুসলিম জমিদারও মুসলিম প্রজাদের প্রতি সদয় নন। কিন্তু মুসলিম জনসাধারণের ধর্মগত প্রশ্নের স্বাভাবিক উন্মাদনা তাদেরও বাস্তব ঘটনাটা সব সময়ে বুঝে উঠতে দেয় নি। রাজনৈতিক অজ্ঞতা তো আছেই।

সুরেন বাঁড়ুজ্যের মতো 'সেকুলার' রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং বিভিন্ন সময়ে গ্রাম-বাংলার কৃষক অবস্থার প্রতি যিনি সহানুভূতিশীল তিনিও শেষ পর্যন্ত শ্রেণী সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেন না।

"ভারত সম্রাট' সপ্তম এডোয়ার্ডের শোকসভায় তিনিও প্রকাশ্যে নতজানু হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চূড়ান্ত করলেন।

গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটল রাজনৈতিক মঞ্চে। প্রথম থেকেই গান্ধীজি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশেল দিয়ে রাতারাতি 'অবতারে' পরিণত হলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমূহ দুর্বলতাগুলি রয়ে গেল। সম্প্রদায়, বর্ণের বিশিষ্ট সমস্যাগুলিকে পাশ কাটিয়ে তিনি শ্রেণী-সমন্বয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক জনসাধারণের গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে উদ্যত হল। ১৯২২এ চৌরিচৌরায় নিগৃহীত কৃষক আন্দোলনকারীদের রোষে বাইশজন কনেস্টবল অগ্নিদগ্ধ হলে গান্ধীজি মাঝপথেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ইতিহাসে এর নাম 'বরদলুই হল্ট'। কংগ্রেসের প্রস্তাবে পরিস্থিতিটির চেহারাটা পরিষ্কার "The working committee advises Congress workers and organizations to inform the peasants thar withholding of rent payment to Zaminders is contrary to the Congress resolutions and injurious to the best interests of the country." একই প্রস্তাবে জমিদারদেরআশ্বাস দেওয়া হল " that Congress movement is in no way intended to attack their legal rights and that even where the ryots have grievances, the committee declares that redress be sought by mutual consultation and arbitration".

গান্ধীজির নেতৃত্বে এদেশে যে গণ-আন্দোলন বারবার প্রস্তুত হয়ে উঠেছে গান্ধীজির শ্রেণীগত আনুগত্য এবং গণ-আন্দোলন ভীতি তাকে সার্থক রূপ নিতে দেয়নি। কারণ গান্ধীজির সীমাবদ্ধ চেতনায় বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষণ সম্ভব নয়। জমিদার ও কলকারখানার মালিকদের পৃষ্ঠপোষণা হারানো কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। নির্যাতিত কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বনও অসম্ভব, ফলত, কংগ্রেসী আন্দোলন অভিজাত-উচ্চ-মধ্যবিত্ত শহুরে বাবু শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। নীচুতলার জনসাধারণ এই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস করতে শুরু করল।

বিশেষ করে বাঙলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম কৃষক সাধারণ এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠলেন। বিশেষত্বটি স্মরণ রাখতে

হবে এদেশের প্রধান জমিদারগোষ্ঠী হিন্দু এবং এঁরা কংগ্রেসের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।

১৯২৮-এ আর একবার সুযোগ এসেছিল। বেঙ্গল টেনানসি অ্যাক্টে কৃষক প্রজাদের জমির উপর অধিক স্বত্ব প্রতিষ্ঠার কথা উঠলে আইনসভার কতিপয় মুসলিম সভ্য ছাড়া স্বরাজ্য পার্টি 'হিন্দু জমিদারের' স্বার্থে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল।

এই শ্রেণীস্বার্থের সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষকে একটু একটু করে সমাজদেহের রক্তে সঞ্চালিত করেছিল।

মুসলিম নেতৃত্ব কৃষকদের এই অসন্তোষকে নিজেদের প্রয়োজনে যখন ব্যবহার করতে চাইল তখন মুসলিম বৃহত্তর জনসাধারণ সহজেই বশীভূত হলেন।

এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাক্তন বদবুদ্ধিই আগামী দিনে জয়লাভ করল। দেশ ভাগ হল।

কাজেই সাম্প্রদায়িকতাকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে যে প্রয়োজনেই কাজে লাগানো হোক না কেন তার বাস্তব অর্থনৈতিক প্রশ্নটিকে বাদ দেওয়া যায়না।

উনিশ শতকী বুদ্ধিজীবী মানস

ব্রিটিশের জয়গান করে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর প্রধান অংশ যে যাত্রা একদিন শুরু করেছিল আজো সে-ঐতিহ্য সে ধারণ করছে বললে ভুল বলা হয়না। দিল্লিতে ১৮৫৭-তে যখন জনতা ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করবার দুর্ধর্ষ সংগ্রাম করছেন তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবী পরম কৃতার্থতার সঙ্গে শাসনে ও শোষণে ব্রিটিশের সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে তখন একটি শক্তিশালী ভূস্বামী শ্রেণী গড়ে উঠেছে; যাদের একমাত্র কাজ চাষীদের লুণ্ঠন করে ঔপনিবেশিক শোষণের জোয়ালে বেঁধে-দেওয়া। রাম-মোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ এ দেশে সেই সব ভূম্যধিকারী, যাঁরা জমিদারি স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা-সংস্কারে মনোযোগ দিয়ে-ছিলেন। একদিকে জমিদারি ব্যবস্থাকে সমর্থন অন্যদিকে দেশের হিতসাধনে সংস্কার করবার শুভেচ্ছা—তাঁদের চরিত্রকে দ্বিমুখী করে তুলেছে। অথচ শ্রেণী-স্বার্থজনিত চিন্তায় এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না। কারণ জমিদারি স্বার্থের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণের শেকল বাঁধা থাকলেও এই সব মনীষীদের অস্তিত্ব প্রতিপত্তি রক্ষার সমস্যাটিও ছিল এর মধ্যে নিবদ্ধ। নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারতে তো এঁরা পারেন না। ততদিনে য়ুরোপীয় শিক্ষাসভ্যতার চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য তাঁদের দেশ সম্পর্কে একটা হীনম্মন্যতা বদ্ধমূল করে দিয়েছে। তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ফেলেছেন ইংরেজ না এলে আমরা ভারতীয়েরা অন্ধকার নরক থেকে এত শীঘ্র মুক্তি পেতে পারতাম না। এই সব মনীষীরা ভুলে গেলেন, যে-"শিল্পবিপ্লব" ইংলণ্ডের একটি গৌরবময় অধ্যায়, তার কাঁচামাল গেছে ভারতের থেকে, এ-দেশকে অমানুষিক শোষণ করে। মুঘল-যুগেও যে উন্নত অর্থনৈতিক ঐতিহ্য আমাদের ছিল, যার স্বাক্ষর তার কৃষি ও তাঁত, রেশম ও লবণ শিল্পে, তাকে গুঁড়িয়ে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হল। ভারতীয় বেনিয়ারা যাঁরা এই সব শিল্পে টাকা লগ্নি করতেন আইন করে তা নিষিদ্ধ করে তাঁদের কেবলমাত্র জমিতে লগ্নি করতে বাধ্য করা হল। এদিকে তখনো যথেষ্ট কৃষি উপযোগী জমির ব্যবস্থা না থাকার জন্যে জমিতে পড়ল

অত্যধিক চাপ, তার ফলে জীবিকার ক্ষেত্রেও বেকারের সৃষ্টি হল। জীবিকার নানান উপায় থাকার জন্যে যা এতদিনও প্রকট হয়নি।

অন্যদিকে একমাত্র ঔপনিবেশিক শোষণের খাদ্য জোগাতে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হল সেখানে কৃষির উন্নতির জন্যে না ইংরাজ না জমিদার কারুরই সেচ ব্যবস্থার জন্যে মাথাব্যথা হল না। যেটা সর্বাপেক্ষা জরুরি ছিল তাকে পরিহার করে, ইংরাজ এদেশের সম্পদকে আরো দ্রুত লুঠ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। এ কথা স্মরণ করা কর্তব্য যে ঔপনিবেশিক শোষণের কৌশলকে ত্বরান্বিত করবার একমাত্র উদ্দেশ্যেই রেলপথ প্রবর্তন করা হয়েছিল।

আমাদের মনীষীরা এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় বেদনাদায়ক নিশ্চুপ। তাঁরা অধিক পরিমাণে ইংরাজ শাসনে অংশ নেবার জন্যে সরকারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ মাধ্যম-সহ ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তনে সক্রিয় সমর্থক হয়ে উঠলেন। ভাষা যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষারই আর একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার, সে-সত্যটা তাঁদের চোখে ধরা পড়ল না। ইংরাজদের যন্ত্রে-প্রস্তুত সামগ্রীর এ দেশে ঢালাও ব্যবসা করতে গেলে যে আচার-আচরণে কালো চামড়ার সাহেব তৈরি করতে হবে সাম্রাজ্যবাদ তা বুঝেছিল। তাই নগরকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার প্রতি ইংরাজ সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করে গ্রাম-ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী বিপদকে দীর্ঘকাল এড়িয়ে গেছে। বলা বাহুল্য ইংরাজের এই উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল, ইংরাজি শিক্ষার কল্যাণে শহুরে ইংরেজিনবীশ বাবুশ্রেণীর সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের আত্মিক সম্পর্ক পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল।

এ কথা স্বীকার করাই নিরাপদ যে, ভূস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে উনিশ শতক থেকে বুদ্ধিজীবীরা যে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ আনেনি। তাই দেখা যায় জমিদারের বে-আইনী আদায়ের অজুহাতেই হোক কী নীল বা সাঁওতাল সমাজের কৃষক বিদ্রোহের কারণেই হোক, সেকালের প্রধান বুদ্ধিজীবীগণ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষীরাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তা রদ করার স্বপ্ন দেখতেও ভালোবাসেননি। তার কারণ কী এই নয় যে সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতার অর্থই ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা? 'নীল দর্পণ' বা 'জমিদার দর্পণ' গ্রন্থদুটি সম্পর্কে বিরোধিতা বঙ্কিমের এই মনোভাব থেকেই।

এটি একটি জনপ্রিয় থিসিস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার দাখিল হয়েছে যে ব্রিটিশ শাসন এদেশে একটি প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু এটা মনে করা হয়ে থাকে ইংরাজ এদেশে বুর্জোআ বিপ্লবের উৎসগুলোকে খুলে দিয়েছে। যেমন, এক-শাসন-কর্তৃত্বে সারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, উৎপাদনে যন্ত্রকে হাজির করেছে, যদিচ নিজস্ব স্বার্থেই। ফলশ্রুতি নাকি ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।

এবং আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরই ব্রিটিশ শাসকের পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা এই অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন!

ব্রিটিশ স্বার্থের গোমস্তাগিরি ও অজস্র অর্থ জমিতে লগ্নি করে জমিদারি, বকলমে ঔপনিবেশিক শোষণের অংশীদার এবং বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মনীষীগণ কী জাতীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন আজকের সচেতন পাঠকই তা বোঝবার চেষ্টা করুন।

এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে অব্যাহত রাখবার জন্যে শিল্পোদ্যমে না গিয়ে ব্রিটিশ প্রাচীন জগদ্দল ফিউডালিজমকেই অক্ষত রেখে নতুন কায়দায় তাকে ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্রের সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে দিল। অর্থ নৈতিক বিপ্লবের স্বপ্নদর্শীরা ক্রমান্বয়ে জমি কিনে বৃহৎ জমিদারে পরিণত হতে লাগলেন। রামমোহন-দ্বারকানাথ কেউ এর বাইরে নন্।

কথাটা স্পষ্ট করে বলবার সময় এসেছে যে দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে ভাঙবার কোনো চেষ্টাই করেনি ইংরাজ, যাতে আমাদের দেশে নতুন অর্থ নৈতিক বিপ্লব সাধিত হতে পারে।

আসলে এই মনীষীরা ব্রিটিশ স্বার্থের সহযোগী হয়ে এমন সব সংস্কার মূলক কাজে হাত দিয়েছেন যাতে ব্রিটিশের আঁতে ঘা লাগেনি। রামমোহন 'সতীদাহ রদের' আন্দোলন না করে যদি 'জমিদারি উচ্ছেদের' আন্দোলন করতেন, যদি সার্বিক অর্থনৈতিক বিপ্লব আনবার প্রয়োজনে ফিউডালিজমের বিরুদ্ধে শিল্পায়নের প্রতি উৎসাহ দিতেন তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁকে কী রকম খাতির করত? দ্বারকানাথের 'প্রিন্স' হবারও সৌভাগ্য হতনা।

বস্তুত এদেশে আধুনিক শিল্পায়নের সূত্রপাত ব্রিটিশ পুঁজি যখন পশম, পাট, কাগজ শিল্পে খাটতে শুরু করল, সেই সময় বম্বের পার্সী সম্প্রদায় পূর্ব

সমুদ্রে ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যের কনিষ্ঠ পার্টনার। কিন্তু সে অবস্থাও বদলে গেল উনিশ শতকের শেষ দশকে। বঙ্গের বস্ত্রশিল্প চালু হল বটে কিন্তু তার নীতি নির্ধারণ করবে ল্যাঙ্কাশায়ার। ১৮৭৫-এ লর্ড লিটনের সরকার মোটা সুতী বস্ত্রের উপর আমদানী কর রহিত করল। শুধু তাই নয়, ১৮৯৪ থেকে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উপর অন্যায় কর চাপিয়ে দেওয়া হল। অবশ্যই সবই ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থে।

রামমোহন, যতদূর জানা গেছে, জমি ছাড়া আর অন্য কোথাও টাকা লগ্নি করেননি। কাজেই জমিদারি ছাড়া তাঁর প্রতিভা শিল্প বাণিজ্যকে স্পর্শ করেনি। সেদিক দিয়ে দ্বারকানাথের কিছু প্রয়াস দেখা যায়। সেটাই বিচার করে দেখা যেতে পারে।

জ্যাঠামশায়ের দত্তক হিসাবে দ্বারকানাথ প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হলেন। তারপর কোম্পানির লবণ ও অহিফেন দপ্তরের দেওয়ান হয়ে তাঁর সম্পদ আরো বৃদ্ধি পেল। শিল্পক্ষেত্রে তিনি মন দিলেন। নীলকুঠি কিনলেন। চিনি চাষের পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। অতঃপর বেণ্টিঙ্কের সুপরামর্শে কার, টেগোর এণ্ড কোম্পানি নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও খুললেন। দ্বারকানাথের মতে "It is the first instance in which an open and avowed partnership had been established between the European and the Bengal merchant." ১৮৩৭-এ এই কোম্পানি মেসার্স আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং এর এর কাছ থেকে চিনাকুরী খনি খরিদ করল এবং ১৮৪৩-এ কার্ টেগোর এণ্ড কোং এর সঙ্গে গিল্‌মোর, হোমফ্রে এণ্ড কোং-যুক্ত হয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানির উদ্ভব হল। দ্বারকানাথ ক্যালকাটা স্টিম টাগ, এসোসিয়েশনের ডিরেক্টার নিযুক্ত হয়ে ১৮৩৬-এ Forbes নামে একটি জাহাজ কিনলেন। টাগ, এসোসিয়েশন মাসে ৩,০০০ হাজার টাকা লাভ করলে স্থানীয় সংবাদপত্রে তাদের ডাকনাম দিল "ঠগ"।

কিন্তু দ্বারকানাথের সমূহ শিল্পোদ্যম ফেঁসে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবন্ধকতায়। দ্বারকানাথ আর্তনাদ করে বলে উঠলেন "taken all which the natives possessed, their lives, liberty and property, and all were held at the mercy of Government."

এই ভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে "অর্থনৈতিক বিপ্লবের" শুরু

করেছিল যার গুণগানে অকারণ আমরা সে ভূমিকাকে পরোক্ষত "প্রগতিশীল" বলে ব্যাখ্যা করতে ভালোবাসি।

ব্যাপারটা কি বুঝতে খুবই কষ্ট হয় যে, পরোক্ষভাবেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে বুর্জোআ বিপ্লবের উৎসমুখ তো খোলেইনি বরঞ্চ দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণাগাররূপে, কাঁচা রসদ সরবরাহের মৃগয়াক্ষেত্রভূমিতে চিরস্থায়ী রাখবার জন্যে ফিউডালিজমকে উৎসাহিত করেছিল। এদেশে বুর্জোআ শ্রেণী —সদর্থে, গড়ে উঠতে সময় লেগেছে। ব্রিটিশের প্রতিবন্ধকতাই তাকে যথেষ্ট বিলম্বিত করেছে।

এই তো গেল ব্রিটিশ-সৃষ্ট তথাকথিত নতুন মধ্যশ্রেণীর হাল।

বঙ্কিমচন্দ্র "বাংলার কৃষক" নিবন্ধে এদের চরিত্রটি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। '১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপর আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।" ভবিষ্যতে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল তারা হয় জমিদার, না হয় ভূমির সঙ্গে যুক্ত মধ্যস্বত্বভোগী এবং তারি আশ্রিত মানুষগুলো, তারাই নগরকেন্দ্রিক ইংরাজি উচ্চশিক্ষার সুফল গ্রহণ করে সরকারি অথবা সওদাগিরি আপিসের আমলা নিযুক্ত হল। এবং স্বাভাবিক কারণে এই শ্রেণীর নিজস্ব চরিত্রে জমিদারির বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য শোনা গেলনা। বঙ্কিমের কথায়, তাহলে "বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।"

লক্ষ্য করবার বিষয় ইংরাজ সিভিলিয়ান উদ্যোগে এদেশে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হবার পর থেকে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে যা কিছু দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা হয়েছে, এই মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বের কারণেই কোনোদিন জমিদারি উচ্ছেদের দাবি উত্থিত হয়নি।

মধ্যশ্রেণীর এই চরিত্রের যাথার্থ্য যদি আমরা স্বীকার করে নিতে পারি তাহলে দ্বিতীয় প্রিয় প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে ইংরাজ আমাদের "জাতীয়তাবাদে" দীক্ষিত করেছে। ইংরাজের কাছ থেকে আমরা পেট্রিয়টিজম্ শিখেছি, ইংরাজরা আমাদের 'বিশ্বমুখীন' করেছে, ইংরাজ আসার আগে 'ইতিহাস' কী করে লিখতে হয় আমরা জানতাম না, ইত্যাকার নানান গবেষণা এদেশে চাউর করেছে বৃহত্তর দেশের মানুষের

সঙ্গে সম্পর্করহিত শিকড়হীন ইংরাজি শিক্ষিত এই মধ্যশ্রেণী, যাদের হাতে আটকানো ছিল আমাদের রাজনীতি।

কথাটা রাজনীতি শোনালেও সত্য। শহুরে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী যে রাজনীতির উত্তরাধিকার আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন তাতে স্বদেশ এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাকে বুদ্ধিমানের মতো এড়াতে গিয়ে তাঁরা হুবহু ইংরাজের রাজনীতিকে এদেশে আক্ষরিক তর্জমা করে দিয়ে দায় চুকিয়েছেন। 'নেশন' অর্থে ইংরাজ যা বোঝে, ভারতবর্ষ কোনো কালে ঐতিহাসিক ভাবেও তা ছিল না। জাতিগত বৈচিত্র্যই এদেশের ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্য। ভারত বলে কোনো নেশন কোনো কালেই ছিল না। বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত বিচিত্র এই দেশ, এই জাতিগত বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়েই এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। উদার হিন্দুধর্ম জাতিগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সূক্ষ্মভাবে মিলনের সূত্র রক্ষা করে চলেছে। এবং সচরাচর যাকে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' বলে উল্লেখ করা হয় তারও প্রেরণা হিন্দু "সংস্কৃতি"। সচেতন পাঠক "হিন্দু" শব্দটিকে যেন সাম্প্রদায়িক অর্থে গ্রহণ না করেন, এই অনুরোধ।

দেশজ প্রকৃতি সম্পর্কে ইতিহাসবোধের অভাবে ইংরাজি-শিক্ষিত আমাদের মধ্যশ্রেণীর নেতৃবর্গ যে গোঁজামিল সৃষ্টি করেছেন তাতে আমাদের ইতিহাসই সঠিক আদল না পেয়ে কখনো পশ্চিমী কখনো প্রাচ্যের মিশেলে এমন কিম্ভূত হয়ে উঠছে যে প্রকৃত স্বরূপটাকে চেনাই যাচ্ছেনা।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ব্রিটিশের পক্ষে এক-শাসনে দেশকে আনার প্রয়োজন হয়েছিল, পরোক্ষতও 'নেশন' গড়বার জন্যে নয়। নিজস্ব জাতি-বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বাঙালী গুজরাতি কী শিখ কারুরই পক্ষে পরাধীনতার জ্বালা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি। রামায়ণের কাহিনীর রস বুঝতে উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতেরও কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। মুখ্যত একজন বাঙালী কৃষক বা শ্রমিকের সঙ্গে বম্বে বা কেরলের কৃষক শ্রমিকের শ্রেণীগত চরিত্রের তফাত নেই। এই 'জাতীয়তাবোধ' ছিল অনেকটা ধোঁয়াটে ধরনের। যেন কেবলমাত্র ব্রিটিশের উচ্ছেদেই এর সীমানা। অথচ দেশের বৃহত্তর মানুষ অদৃশ্য দেবতার মতোই সবসময় যে ব্রিটিশ শত্রুকে বুঝেছে তা নয়। চাষির কাছে ভূস্বামী, মহাজন, কী মধ্যস্বত্ব ভোগীর শোষণের ব্যাপারটাই ছিল প্রত্যক্ষ সত্য, যে কারণে জাতীয়তাবোধের অভাবেও

এদেশের কৃষক বহুবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

অথচ যে মধ্যশ্রেণী এদেশে রাজনীতি পরিচালনা করেছেন তাঁদের ইংরাজি ধারণাপুষ্ট জাতীয়তাবোধের সঙ্গে প্রকৃত দেশের সমস্যার কোনো যোগ ছিলনা। তাঁরা উপর-উপর এদেশে শাসনকার্যের ব্যাপারে ইংরাজের পরিবর্তে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছিলেন। আমাদের দেশ আমরাই শাসন করব—এই ছিল লক্ষ্য। বিষয়টা সহজ মনে করলেও সহজে যে মেটেনা এটাও গভীর ভাবে উপলব্ধি করার দরকার। বিদেশী ইংরাজ এদেশের সত্যকার অবস্থাটা বোঝবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে তাদের দেশের নিজস্ব পার্লামেণ্টারি শাসন পদ্ধতি, বিচারশালা, আইন, শিক্ষার সংস্কারগুলো আমাদের কাঁধে থাবড়া মেরে বসিয়ে দিয়েছে। পাইকারী অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের দেশে এই বিলাসগুলি ক'জন মানুষের পক্ষে উপযোগী ছিল, আজ তা চোখ বুজেও বলে দেওয়া যেতে পারে। ইংরাজ-সৃষ্ট শহুরে মধ্যশ্রেণী, ইতিহাসের নিয়মে ভবিষ্যতে যাঁরা এদেশের শাসক-শ্রেণীতে উন্নীত হবেন এবং যাঁরা সাম্রাজ্য-বাদী চরিত্রের অতিরিক্ত ইংরাজের চিত্তের ঔদার্যকে ভালোবেসে ফেলেছেন, তাঁরা যে ইংরাজের সুযোগ্য উত্তরসাধক হবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাৎপর্য

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বিচার না করলে আসল সমাজ-ইতিহাসটাকেই আমরা ধরতে পারব না। কারণ এই ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় বাঙালী মধ্যশ্রেণীর যাবতীয় ধ্যান-ধারণা বহুকাল ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এবং কথাটা স্বীকার করলে অন্যায় হবে না যে, এই গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকার কারণেই আমাদের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ভবিষ্যত সমাজ-নির্মাণে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছেন। যদিও সমাজ-ঐতিহাসিকগণ মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে মনীষীদের ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা–সংস্কারকে বড় করে দেখে তাঁদের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে চিত্রিত করতে ভালোবেসেছেন। প্রশ্নটা জাগতে পারে অন্তত ঐতিহাসিকগণও ভূস্বামীদের স্বার্থের বাইরে সমাজ-পর্যবেক্ষণ করবার নির্ভুল শক্তিটাকে আয়ত্ত করতে পারলেন না কেন? উত্তর একটিই। এই ঐতিহাসিকদের চেতনাও ভূ-স্বামীদের স্বার্থের বাইরে ছিল না। কারণ এই সমস্ত ঐতিহাসিক শহুরে ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীরই অংশ, যাঁরা পাকেচক্রে জমিদারি স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত।

এখন কথা হচ্ছে জমিদারি ব্যবস্থার প্রশ্নটিকে মুলতুবী রেখে অন্য কোনো ক্ষেত্রেও কী প্রগতিশীল ভূমিকা নেওয়া যায় না? আমাদের বিচারে, না।

কারণ, সর্বপ্রথম এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমই ইংরাজ রাজস্বের নাম করে এ দেশে ঔপনিবেশিক শোষণকে আইনসঙ্গত করল। এবং জমি-রাজস্বই ছিল এ দেশে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন, যার সঙ্গে সুপরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করা হল আমাদের স্বয়ম্ভর পল্লীকেন্দ্রিক কুটির শিল্পাশ্রয়ী অর্থনীতিকে। 'কুটির শিল্প' পদ্ধতিকে যেন আমরা ছোটো করে না দেখি কারণ একে কেন্দ্র করে' আমাদের গড়ে উঠেছিল বিশ্বব্যাপী উন্নত ব্যবসা বাণিজ্য। প্রধানত আরব বণিকদের মাধ্যমে এই সরবরাহ পৌঁছেছিল বহির্ভারতের ক্রেতাদের কাছে। কৃষির সঙ্গে এই কুটির শিল্পের স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিল। সারা বছর কুটির শিল্পে বা কৃষিতে কাজ থাকার জন্যে কর্মহীন বেকারের সংখ্যা তেমন প্রবল ছিল না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ইংরাজ আমাদের কুটির শিল্পকে ধ্বংস করল। এমন কি যে সব ভারতীয় বেনিয়া শিল্পে লগ্নি করে স্বাধীন ব্যবসা করছিল তাদের প্রতিপত্তিও নষ্ট করা হল। ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যে ভারতীয় প্রতিযোগিতাকে বন্ধ করবার জন্যে এদেশের বেনিয়াদের একমাত্র জমিতে লগ্নি করতে বাধ্য করা হল। জমি-রাজস্ব কাঁচা পয়সায় আদায় দেবার প্রথা চালু হওয়ার সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থায় নতুন মহাজন শ্রেণী গড়ে উঠল। তারা একই জমিদারি শ্রেণী থেকে উদ্ভূত অথবা নতুন অংশ গ্রহণ-কারী। জমিদার ও মহাজন সিন্ধবাদের ভূতের মতো রায়তের কাঁধে জাঁকিয়ে বসল। এ দেশের বৃহত্তর শ্রেণী হচ্ছে কৃষক, জমিদার বা মহাজন নয়, কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নটি খতিয়ে দেখতে গেলে আমাদের কৃষক দের অবস্থার প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

ফলত, যে-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ দেশের অর্থনৈতিক প্যাটার্নটাকেই বদলে দিল, এবং যার সঙ্গে এ দেশের বৃহত্তর মানুষের স্বার্থ জড়িত, সে-প্রশ্নটির পক্ষে বা বিপক্ষে কারা আছেন, তার উপরই নির্ভর করবে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার চারিত্র্য। এবং সে কারণে যদি মনীষীদের পুনর্মূল্যায়নের ঐতিহাসিক কর্তব্য আসে, তাহলে তা উপেক্ষা করলে সংখ্যাগুরু মানুষের মঙ্গল হবে না।

অথচ, আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার মধ্যেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো বিষয়টি স্থান পায়নি। পরবর্তীকালে, বিশ শত-কের ত্রিশের দশকে যখন এ নিয়ে আলোচনা হল তখন জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাবটাও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আগের কথায় ফিরে আসা যাক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে দেশের অবস্থাটা বিচার করে দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে ভারতীয় জমিদারদের মতো ১৮৩৩-এর চার্টার আইন অনুযায়ী য়ুরোপীয়দেরও জমির স্বত্ব দেওয়া হল, যার ফলে সাহেবদের মালিকানায় বাগিচা গড়ে উঠল। ভারতীয় জমিদার ও সাহেব বাগিচা মালিকদের সুলভে বিত্তশালী হবার অমানুষিক লালসায় ১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ এই পনেরো বছর বাদ দিলে ১৮৬৬ থেকে ১৯০০-এর মধ্যে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর অন্তর দুর্ভিক্ষের অভিশাপ লেগেই ছিল। মধ্যযুগের বর্বরতার হাত থেকে ত্রাণকর্তা হিসাবে ইংরাজ রাজত্বের গুণগ্রাহীর সংখ্যা এ দেশে এখনো কম নয়, তাঁরা অনুগ্রহ করে বিষয়টা নতুন করে ভেবে দেখতে পারেন। এই

জাতীয় পঞ্চবার্ষিক দুর্ভিক্ষ নিরোধ কল্পে সেচ ব্যবস্থার প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল তার পরিবর্তে দূরবর্তী বাজার কব্জা করতে ইংরাজ বণিকস্বার্থে রেলপথ খোলাই অগ্রাধিকার পেল।

কথাটা মেনে নেওয়াই ভালো যে ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির দিকে ইংরাজের লক্ষ্য ছিল না। দারিদ্র্য আর হতাশার দীর্ঘশ্বাসে ব্রিটিশ শাসন এদেশে ভারি হয়ে উঠেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষেরই নামান্তর। অথচ বেশির ভাগ রাজস্ব আদায় হত এই জমিদারি এলাকা থেকেই। তদানীন্তন ভারতের রাজ্য সচিব লর্ড স্যালিসবারিকেও মন্তব্য করতে হয়,

"It is not in itself a thrifty policy to draw the mass of revenue from the rural districts, where capital is scarce, sparing the towns where it is redundant and runs to waste in luxury".

তিনি আরো বললেন,

"As India must be bled, the lancet should be directed to the parts where the blood is congested, or at least sufficient, not to those which are already feeble from the want of it".

সাম্রাজ্য-স্বার্থবাহী একজন বিদেশীর চোখে সেদিন যে মর্মান্তিক চিত্রটি ধরা পড়েছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা শ্রেণীগত স্বার্থেই সে-সম্পর্কে নিশ্চুপ। অথচ বৃহত্তর মানুষের কল্যাণের প্রশ্নে আজকের সচেতন মানুষের নীরব থাকা অমার্জনীয় অপরাধ। বিষয়টির পুনর্বিচারে প্রচলিত চিন্তাধারায় আঘাত লাগলেও ঐতিহাসিক সত্যে আমাদের পৌছতেই হবে। সূর্য পূর্ব দিকে উঠবেই—এটাই যদি নিয়ম হয় তাহলে সে কালের মনীষীদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার নিয়মটিকেও মেনে নিতে হবে। কারণ এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য।

অন্যদিকে শ্রেণীগত স্বার্থেই এ দেশের কৃষক শ্রেণী জমিদারি-রূপ শোষণকে মেনে নিতে পারিনি। এটাও সমান সত্য। কাজেই এই কৃষক বিক্ষোভের দলিলগুলিও সকলের সমক্ষে তুলে ধরার প্রয়োজন।

১৮৬২-এর প্রত্যুষে মীর কাসিম ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এক অংশ সিপাহীকে সমবেত করে ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'শতাব্দী ধরে বাঙলা দেশের কৃষকশ্রেণী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বস্তুত

আঠারো ও উনিশ শতকের ব্রিটিশ বিরোধী লড়ায়ের প্রধান প্রেরণাই হচ্ছে কৃষকশ্রেণী। ১৭৮৩ রংপুরে, ১৭৮৯ বিষ্ণুপুরে, ১৭৯৫-৯৯ মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-মানভূমে চুয়ার বিদ্রোহ, ১৭৭০-১৭৯০ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, ১৮৩১ বারাসাতে তিতু মীরের বিদ্রোহ, ১৮৩৮-৪৭ ফরিদপুরে ফেরাজী বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৭-৮০ বাঙলা দেশে নীল বিদ্রোহ, ১৮৭৩ পাবনা বিদ্রোহ—এ দেশে কৃষক অভ্যুত্থানের রক্তরাঙা ইতিহাস।

পাবনা কৃষক বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি আজকের অচেতন পাঠকদের সামনে রাখার প্রয়োজন বোধ করছি।

নাটোরের রাজার দখলে পাবনা পরগণা ভাগ হয়ে গেলে এই পাঁচজন জমিদারি খরিদ করেন। এক, কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি, দুই, ঢাকার ব্যানার্জিরা, তিন, সালোপের সান্যালরা, চার, সাথালের পাকড়াশিরা, পাঁচ, পর্জনার ভাদুড়িরা।

এই "জমিদার"-গোষ্ঠী বেআইনী করের জুলুমে কৃষকদের রক্তাক্ত করে দিলে প্রধানত মুসলমান প্রজারা পাবনা কৃষি লীগ নামে একটি দৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলেন। নেতৃত্ব করেন দুজন হিন্দু ঈশানচন্দ্র রায় ও শম্ভুনাথ পাল। কৃষকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, সরকারকে বাধ্য হয়ে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করতে হয়। সরকার যাতে প্রজাদের স্বার্থে কোনো আইন প্রণয়ন করতে না পারে তার জন্যে এই জমিদার চক্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে তীব্র বিরোধিতা করে অভিমত প্রকাশ করে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদারের অধিকারকে কোনো মতে লঙ্ঘন করা চলবে না। জমিদারদের মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃত বাজার পত্রিকা, হালিশহর পত্রিকা জমিদারের স্বার্থে বিষোদ্গার ছড়াতে লাগল এই বলে যে কৃষকদের এই "লীগ" আসলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার নজির যার অজুহাতে এরা "হিন্দু" প্রতিবেশীদের ঘর লুঠ করছে, আগুন জ্বালাচ্ছে, ইত্যাদি। এই প্রতিক্রিয়াশীলদের সমবেত চাপ সত্ত্বেও সরকার ১৮৮৫-এর "বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্টে" প্রজাদের স্বার্থ কিছুটা রক্ষা করে জমিদারের স্বৈরাচার থেকে প্রজাদের স্বস্তি দেন।

"কাঙাল হরিনাথের ডায়েরি" এ বিষয়ে আরো কিছু আলোকপাত করতে পারে। উল্লেখ্য সুরেন বাঁড়ুজ্যে পাবনা প্রজাদের আন্দোলন সমর্থন করেন।

এই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থ। যেহেতু সত্য নিরপেক্ষ নয়, পারস্পরিক, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ত-প্রভু অন্য-দিকে কৃষকের স্বার্থ, সবই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপরীত হলেও অবশ্যই শ্রেণীগত সত্য। এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো বিষয়ই মুক্ত হতে পারে না।

ফলত, উনিশ শতকের প্রধান বাঙালী বুদ্ধিজীবী রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের বিচারে তাঁদের পিছনের জমিদারির চালচিত্রটিকে বর্জন করা যায় না। তাঁরা যে জমিদারি স্বার্থকে বজায় রাখবেন এইটেই তাঁদের শ্রেণীগত সত্য। এঁরাও কখনো কখনো এই ব্যবস্থার শিকার কৃষকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সহানুভূতি জানিয়েছেন বটে, কিন্তু মূল সমস্যার গভীরে স্বাভাবিক কারণে প্রবেশ করেননি।

এখন দেখা যাক সে যুগে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া যায় কিনা।

"ইয়ং বেঙ্গলের" অন্যতম প্রধান নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তকে নাকচ করে ঘোষণা করেন যে হিন্দু ও মুসলিম শাসনে "the right in the soil was in private individuals, and that it was a great mistake to have converted the Zeminders, who were the collectors of revenue into proprietors of landed estates, by which act the rights of a vast number have been sacrificed".

১৮৫৯-এ নীল বিদ্রোহে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি স্পষ্টতই কৃষকদের স্বার্থ অবলম্বন করেন।

দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" ও মুশারফ হোসেনের "জমিদার দর্পণ" একই সহানুভূতি বহন করছে।

অভয়চরণ দাসের "ভারতীয় রায়ত" (১৮৮১) গ্রন্থটি এই প্রতিবাদী ধারার সোচ্চার রচনা। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা, অভয়চরণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে খারিজ করে কৃষকের হাতে জমির স্বত্ব দেবার জন্যে ওকালতি করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপে জমিদারদের স্বার্থহানির প্রশ্নে ক্ষতিপূরণের কথা উঠলে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, জমিদারদের সঙ্গে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেহেতু বছরের পর বছর এরাও বৈষম্যমূলক করভারে উৎপীড়িত হয়েছে। কৃষক-বিদ্রোহকে সমর্থন করে সেকালে অভয়চরণই বলতে পারেন,

"Is it possible for men to hold up their hands......and thus pave the way to starvation, when we see the lower animals form combinations among themselves to withstand the attack of the enemies? Certainly not. Their very conscience—we may say their very human nature—points out to them the combination as the only means ...Our readers may think, that we are hereby encouraging the ryots to resort to violence. No. We are far from doing that, we are only saying that men in general are very much disposed to take the law into their hands, when they see the Courts of justice virtually shut up against them".

উনিশ শতক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে দুটো বিপরীত ভাবধারা চলে এসেছে। সংখ্যায় কম হলেও বিরুদ্ধবাদীরা আজকের সচেতন পাঠকের কাছে অধিক শ্রদ্ধার যোগ্য। এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর অংশটি চিরকালই এ দেশে প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্যের তুলনায় দুর্বল এ সত্যও মেনে নেওয়া ভালো। তা না হলে উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত প্রগতিশীল শক্তি এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের নিয়ামক হতে পারত।

দুঃখ করে লাভ নেই, এই অন্যায় প্রথার উপর আমাদের সুপারস্ট্রাকচার গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘ সহবাস যেমন আচারে-মননে আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে তেমনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশ্রয়ে উক্ত প্রভাবশালী শ্রেণীর দর্শন মধ্যশ্রেণীকে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো জর্জরিত করে রেখেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরাজ শাসকের সহযোগী একটি মধ্যশ্রেণীই তৈরি করল না শুধু, তার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া কি ভাবে আমাদের রাজনীতি, সংস্কৃতি সাহিত্যশিল্প তাবৎ উপরিতলকে জয় করে নিল, সে বৃহত্তর ঘটনাটাও স্মরণ করতে হবে। উনিশ শতকে কোনো বুর্জোআ রেনেসাঁস আমাদের দেশে হয়নি, সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে' আধুনিকতার নাম করে' ইংরেজিয়ানাকে অন্ধের মতো মকসো করেছি। তথাকথিত রেনেশাঁসওয়ালারা নিজেদের সাহেবদের জুনিয়ার পার্টনার হিসেবে ভেবে এমন সব সংস্কার নিয়ে মাথাব্যথা শুরু করলেন যেগুলো খোদ 'ব্রিটিশ প্রজার' কাজ।

অর্থাৎ ধরে নেওয়া হল ইংরাজ-শাসন ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং নেটিভদের পরম সৌভাগ্য যে ইংরাজকে প্রভু হিসেবে পেয়েছে। এই ধারণা থেকে মূল ইংলণ্ডে বসে সেখানকার প্রজা যে সব সংস্কার নিয়ে সেদিন মাথা ঘামিয়েছে এখানকার প্রজারাও তারই অনুকরণ করতে শুরু করলেন। আসল কথা ইংরাজ প্রজার দৃষ্টিভঙ্গিতেই এদেশে 'নেটিভ প্রজা' সমস্যাগুলোকে ধরতে চেষ্টা করলেন। এ দেশটা যে একটা কলোনি এবং এখানকার মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে ইংরাজ সরকারের যে তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক, এই মোদ্দা প্রশ্নটাই ভুলে যেতে ভালোবাসলাম আমরা

বলা বাহুল্য ইংরেজ-শাসক মনেপ্রাণে এমনি একটি মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তার উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল বলতেই হবে। যেমন করে এই বুদ্ধিজীবীর মনোযোগ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সরে গিয়েছিল তেমনি তাঁরা ভূস্বার্থে জড়িত থাকার কারণে তো বটেই, অধিকন্তু তাঁদের আশ্রিত বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে জমিদারি ব্যাপারটার শ্রেণীচরিত্রটি আড়াল পড়ে গিয়েছিল। ঘষা পয়সা যেমন করে বাজারে চালু হয়ে যায় তেমনি জমিদারির মতো একটা গর্হিত ব্যবস্থা সমাজে দিব্যি জলচল হয়ে গেল। এই ব্যবস্থা দ্বারা যারা উপকৃত তাঁরা তো বটেই, এমনকি যাঁরা এ দ্বারা শোষিত তাঁদেরও ভোলাবার ব্যবস্থা হল। দিনগতে শোষিত কৃষকটিও একদা এই ধাঁধাটা আবিষ্কার করতে পারল না যাঁর সঙ্গে জমির শারীরিক কোনো সম্পর্কই নেই তিনি কোন্ অধিকারে তার সম্পদ দাবি করেন? ক্রমে সূর্য যেমন সত্য জমিদারও তেমনি সত্য হয়ে উঠলেন। চাষির দুরবস্থার জন্য কোনো জমিদারই দায়ি নন, দায়ি তার কর্মফল, তার অদৃষ্ট। একযোগে ঢ্যাড়া পেটানো হল পল্লীর যা কিছু উন্নতি জমিদারের জন্যই। 'সৎ' জমিদাররা গ্রামে ইস্কুল খুলেছে, ডাকঘর খুলেছে, দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছে, জমিদারের উদারতায় গ্রামে 'শুভ উৎসব' হয়, প্রজা-নির্বিশেষে সকলের সেখানে নিমন্ত্রণ।

কাজে কাজেই জমিদারি থাকাটা জরুরী, গ্রামের সার্বিক উন্নতির জন্যে। 'অসৎ জমিদার' গ্রামের সর্বনাশের কারণ।

একটা 'অসাধু' ব্যবস্থাকে এই ভাবেই গোবর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেবার আয়োজন।

চাষি যদি সচেতন হতেন তবে বুঝতে পারতেন 'সৎ' জমিদারের তথাকথিত

ভালো কাজগুলির খরচনির্বাহ প্রজাদের উপর আইনী-বেআইনী আদায়ের দ্বারাই সাধিত। জমিদার যেমন পারতপক্ষে জমির জন্যে এক কার্দিংও খরচ করেন না তেমনি গ্রামের ভালো কাজগুলির খরচও তিনি বহন করেন না। খরচ আসে প্রজাদের কাছ থেকেই কোনো না কোনো প্রকারে।

এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রচারে যেমন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করে' ইংরাজের চিত্তপ্রসারের কথা বলা হয়, এমন কি কেউ কেউ 'ছোট ইংরেজ বড় ইংরেজ' ভাবতেও ভালোবাসেন তেমনি 'সৎ' 'অসৎ' জমিদারের কথাও প্রচার করা হয়। অথচ সমাজ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করবেন যে তাবৎ জমিদারি ব্যবস্থাই অন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, শোষণই যার মূল কথা, সেখানে সৎ অসতের কোনো প্রশ্নই নেই। সেই জমিদার মহাত্মাই হোন কী মহর্ষিই হোন্, চেহারাটা একই। ব্যাপারটা চরমে দাঁড়ায় যখন ইস্কুল-পাঠ্য কেতাবে 'পুণ্যাহে' রবীন্দ্রনাথ কেমন আভিজাত্যের বেড়া ডিঙিয়ে প্রজাদের সঙ্গে এক আসনে বসে জমিদারের আদর্শ নিদর্শন রেখেছিলেন বলে' গুণকীর্তন করা হয়। আসলে এই পুণ্য দিন কার? খাজনা আদায়ের এই মহরৎ নিশ্চয়ই দুঃস্থ প্রজার কাছে আনন্দের দিন নয়! রবীন্দ্রনাথ যদি এই 'পুণ্যাহ' ব্যাপারটাই তুলে দিতে পারতেন তাহলেই তাঁর পক্ষে সত্যিকার আদর্শ কাজ হত। এই পুণ্যাহের আদায়টাও যথেষ্ট আইনসঙ্গত ব্যাপার বলে' ধরা যায় না। আইনের বাইরে জমিদার যে কত কৌশলে বেআইনী আদায় করেছে ইতিহাস তার সাক্ষী। পাবনার জ্বলন্ত কৃষক-বিদ্রোহ তার প্রমাণ। মহর্ষি জমিদার দেবেন্দ্রনাথ যার সঙ্গে যুক্ত।

রাষ্ট্র, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ জমিদারের এই চিরস্থায়ী অধিকারকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করল। এবং তাবৎ মানুষকে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত করল। দীর্ঘ দুই শতাব্দী এই প্রধান বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল না। জমিদারি আশ্রয় করেও মনীষীগণ 'ভারত পথিক' মহাত্মা, আদরের 'প্রিন্স', 'মহর্ষি' ইত্যাকার উজ্জ্বল বিশেষণে ভূষিত হয়ে উঠলেন। ভূস্বামী ও তাঁর আশ্রিত সমাজ-ব্যাখ্যাতারা এই কিম্বদন্তীকে সইয়ে দিলেন।

একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে সেদিন থেকে মধ্যশ্রেণী যে দু মুখো নীতি গ্রহণ করলেন তার ফলে আমাদের সামাজিক ইতিহাস অর্ধসত্য বা অর্ধ মিথ্যায় ঘুলিয়ে উঠল।

জমিদারের শ্রেণীদর্শন ব্যাপক জনগণের দিক্‌নির্দেশ হয়ে উঠল।

জনগণের কাছে প্রভাবশালী হাতিয়ার হিসেবে সাহিত্য এই শ্রেণীর তল্পিতল্পি বহন করতে এগিয়ে এল।

বঙ্কিমচন্দ্র তার ভগীরথ। মাইকেলের ঐশ্বর্যবান্ কবিত্ব ব্যাপক পাঠককে অভিভূত করতে পারেনি। 'বাংলায় কৃষক' শীর্ষক নিবন্ধে বঙ্কিমের কৃষক সমাজ সম্পর্কে আশ্চর্য বস্তুবাদী উদ্ঘাটন থাকা সত্ত্বেও শ্রেণী-আনুগত্যকে তিনি পরিহার করতে পারলেন না। সামাজিক উপন্যাসে তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি জমিদার, কিন্তু শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। কৃষ্ণকান্ত, গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র—তাঁদের কারুর সঙ্গেই কৃষকের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। কারণ তাঁদের 'চরিত্র' হিসেবেই ভাবা যায়, জমিদার না হলেও ক্ষতি নেই। এই প্রসঙ্গে 'নীল দর্পণ' বা 'জমিদার দর্পণ' সম্পর্কে বঙ্কিমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্মর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত 'ভালো জমিদার' 'মন্দ জমিদার'-রূপ থিসিসে তাঁর অপূর্ব দূরদৃষ্টিকে বন্ধক দিয়েছেন। এবং একই শ্রেণীস্বার্থে এ দেশে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের জয়ধ্বনি করেছেন।

এক বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করলেই তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চরিত্রের এই দোটানা আবিষ্কার করা যায়। যিনি 'বাংলার কৃষক' লেখেন, যিনি কমলাকান্তের দপ্তরের তীক্ষ্ণ সরস বর্ণনায় লোক চরিত্র-সহ 'বিড়ালের' মাধ্যমে 'সমাজতন্ত্রের' আদর্শের আশ্চর্য বিশ্লেষণ করেন তিনিও শ্রেণীদায়িত্বে 'বিপ্লবের অনুমোদক' হতে পারেন না। একেক সময় মনে হয় বঙ্কিম আত্মদর্শন করছেন। সে যুগে বঙ্কিম এ বিষয়ে সচেতন, জ্ঞানপাপী বললেও ভুল বলা হয় না।

গল্পে আছে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গলার মালা রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দিয়ে সাহিত্যে কবিকেই তাঁর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ক'রে গেছেন। গল্পের সত্য-মিথ্যা যাই থাক না, এটাকে প্রতীক হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। শ্রেণীগত স্বার্থেই বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে মনোনয়ন করবেন, এইটেই স্বাভাবিক। পিতৃপিতামহসূত্রে প্রাপ্ত জমিদার পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য পুত্রের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার প্রতিভাকে তারিফ করেছেন। খাজনা আদায় করতে রবীন্দ্রনাথ মহলে মহলে ঘুরেছেন, যা নাকি গ্রাম্যপ্রকৃতি ও মানুষ সহযোগে তাঁর চেতনায় প্রকৃতি ও মানবপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। জমিদারি ও কবিসত্তার মধ্যে কোনো বিরোধ না ঘটিয়ে অদ্ভুত সুসমঞ্জস করেছিল তাঁর

মনোভঙ্গিকে। 'সৎ' জমিদারের দানে গ্রামের উন্নতির থিয়োরি কবির মনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। জমিদার ও প্রজা দুইই স্বাভাবিক নিয়মের ফল, রবীন্দ্রনাথ দুইয়ের মধ্যে শ্রেণীগত বিরোধের সত্যকে অস্বীকার করেছেন। বরং যাঁরা সরল, নিরীহ প্রজাদের উসকানি দিচ্ছেন তাঁদের সম্পর্কে 'রায়তের কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তীব্র মন্তব্য করেছেন "ইদানিং পশ্চিমে বলসেভিজম্, ফাসিজম্ প্রভৃতি যে সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ, তার আকারপ্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল।" বলে' রায় দিলেন "রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া।" রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করছেন "আমি জানি জমিদার জোঁক; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।" স্বীকার করেও জমিদারি ছাড়ছেন না কেন? রবীন্দ্রনাথের যুক্তি: "'প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড় জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে।...মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনো মতে নিজেকে রক্ষা করতে জানেনা। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরের জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছনছ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই।" দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, এই সব ভবিষ্যতের কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ রায়তের হাতে জমিদারি ছেড়ে দিতে রাজি নন্। এই ভূমিকাটির রচনাকাল ১৯২৬। যতদূর স্মরণ করতে পারছি, ১৯২৮-এ প্রজাদের স্বার্থে আইন পাশ করবার চেষ্টা হলে মুষ্টিমেয় মুসলমান সভ্য বাদ দিলে তাবৎ হিন্দু জমিদার ও বঙ্গীয় আইন সভার স্বরাজ্য পার্টি'র সভ্যরা প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি আমাদের পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল। যেহেতু এর সঙ্গে সংখ্যাগুরু মুসলমান কৃষকদের স্বার্থ জড়িত ছিল সেহেতু নেতাদের এই বিরুদ্ধাচরণকে তাঁরা সুনজরে দেখতে পারেননি। উত্তরকালে জাতীয় আন্দোলন থেকে বৃহত্তর মুসলমান সমাজের সরে যাওয়ার ইতিহাস এইভাবেই রচিত হয়েছিল। বৃহত্তর সমাজের মনে এই সন্দেহ, অবিশ্বাস,

ভবিষ্যতের সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

বিশাল রবীন্দ্র-রচনায় 'বিশ্বমুখীনতা' 'মানবতাবাদ' জাতীয় উচ্চ আদর্শের জয়গান রয়েছে, কিন্তু জমিদার-প্রজার খাদ্য-খাদকের বাস্তব সম্পর্কের বিশ্লেষণ নেই। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদারের শোষণকে তিনি "এ জগতে হায় সেই বেশি চায় যার আছে ভুরি ভুরি" জাতীয় দার্শনিকতার আলোকে দেখাতে চেয়েছেন। উৎপীড়িত 'উপেনের' মনস্তত্ত্বে তিনি নিজস্ব মানসিকতাকেই চাপিয়ে দিয়েছেন। যেন উপেনের সমস্যাটা 'সৎ' জমিদারের মহানুভবতার উপরই নির্ভর করছিল। 'অসৎ' জমিদারের দায়িত্ব তো রবীন্দ্রনাথ নিজের কাঁধে নিতে পারেন না! সততা বা অসততার উপরই কৃষকের ভালো-মন্দ নির্ভর করছে! 'সৎ' জমিদার রবীন্দ্রনাথকে এ-সমস্যা পীড়িত করেনি। তাই যে ফিউডালিজমের উপর জমিদারি-ব্যবস্থা টিকে রয়েছে রবীন্দ্র-রচনায় বার বার সেই পল্লী-প্রীতি, শহরের কল-কারখানা-লোহা-লক্কড়ের বাইরে, অহরহ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পল্লীপ্রকৃতির ছায়ায় গড়ে-ওঠা তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রাচীন কালের তপোবনে ফিরে যাওয়ার আকুতি।

রবীন্দ্রনাথের অজস্র গল্প-কবিতায় পল্লীজীবনের আবহ সৃষ্টি করেছে, কখনো সখনো চাষিজীবন উঁকি মেরেছে, কিন্তু কৃষক-জমিদারের মূল অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের চিত্র নেই। কারণ অর্থনীতিকে মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক বলে রবীন্দ্রনাথ কখনো মনে করেননি। এক জাতীয় ভিক্টোরিয়ান হিউম্যানিজম দেশ-কাল-মানুষের উর্ধ্বে স্নেহজাতীয় পদার্থের মতো তাঁর সাহিত্য-কর্মকে রসসিক্ত করে রেখেছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ কখনো তাঁর ব্যক্তিত্বে বা রচনায় দেখা যায়নি। তবু, এই রবীন্দ্রনাথই ১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের গর্হিত বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদের আন্দোলনে শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকাও স্বল্পস্থায়ী। কারণ ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর কোনো কালেই উৎসাহ ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী-চরমপন্থীর বিভেদ সৃষ্টি হল, আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ যে বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠল, সাম্রাজ্য-

বাদের পরিভাষায় যার নাম সন্ত্রাসবাদ, তার তাৎপর্যও রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পারলেন না। তিনি অচিরে রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থায়ী হলেন। অবশ্য ১৯১১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে ইংরাজ সন্তান রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডকে (পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) না পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি রচনা করে দিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ মেনে নেবার জন্যে অধিবেশন থেকে ইংরাজ সরকারকে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করা হল।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে এই বক্তব্য সূত্রহীন মনে হলেও সচেতন পাঠকদের বিষয়টি বুঝতে হবে। সেটা এই, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত চরিত্রটিকে হয় তাঁরা ধরতে পারেননি অথবা সহযোগীর স্বার্থে সে বিষয়ে নিশ্চুপ। ছোটো ইংরেজ বড় ইংরেজ-রূপ থিসিসে ব্রিটিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা ব্রিটিশ-শাসকশ্রেণীর কাছেই দরবার করেছি। আগেই বলা হয়েছে এই শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী সমাজের শ্রেণীদর্শন তাবৎ নাগরিক মধ্যশ্রেণীকেই আচ্ছন্ন করে রাখার ফলে আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তথা ভূস্বামীবিরোধী হতে পারেনি। এবং এই সাহিত্যই দীর্ঘকাল ধরে পাঠক-লেখক আনুকূল্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সৌভাগ্যের কথা, এই সাহিত্যের ফলশ্রুতি সার্বিক নিরক্ষরতা ও নগর জীবন থেকে দূরে থাকা বৃহত্তর গ্রামীণ মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করতে পারল না। বৃহত্তর মানুষ এই একপেশে সাহিত্যের আওতা থেকে নিরাপদ থাকল।

এই সাহিত্যকে কী "কলোনিয়াল সাহিত্য" বললে ভুল বলা হবে? অথচ আমেরিকা, যা একদা ইংলণ্ডের কলোনি ছিল, সেখানকার সাহিত্যের ঐতিহ্যও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়, আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের কেন এমন হল? উত্তর একই, আমাদের মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজের শোষণে-শাসনে জুনিয়ার পার্টনারের সৌভাগ্যেই কৃতার্থ হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন "তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য ইউরোপের চিত্ত প্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে" ইত্যাদি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি "ইউরোপীয় চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল।" (কালান্তর, ১৯৩৩)।

সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রতি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এই গুণগ্রাহিতাই এ দেশে ব্রিটিশকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল।

বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সাচ্ছল্যে পুষ্ট নাগরিক বুদ্ধিজীবী নিজস্ব একটি ভাবজগত তৈরি করবার প্রেরণায় এমন একটি আদর্শ খুঁজছিল যার প্রতীক হলেন রবীন্দ্রনাথ, যার নাম হল 'রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতি,' গৌরবে যার ব্যাপ্তি হল ''রবীন্দ্রযুগে''। ক্রমাগত প্রচারে এই সত্য জল হওয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ স্বাভাবিক বলে' কীর্তিত হল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হল রবীন্দ্রচর্চা মানেই বাঙালীর জীবনচর্চা!

সাহিত্য-ঐতিহ্যে ফাটল ও শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্র-সংস্কারে যখন শিক্ষিত নাগরিক বাঙালী স্থায়ী নিরাপত্তা ও আরাম বোধ করছেন তখন এই মধ্য শ্রেণীর নীচের স্তর থেকে যৌবন প্রায় উত্তীর্ণ করে রুগ্‌ণ শীর্ণ শরৎচন্দ্র দীর্ঘ কয়েক বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে ১৯১৬-তে পাকাপাকি স্বদেশের সাহিত্য-বাতাবরণে অবতীর্ণ হলেন। কী ব্যক্তিগত জীবনে কী সাহিত্যাদর্শে রবীন্দ্র-চালচিত্রের বাঁধনে তাঁকে আটকানো গেলনা। প্রচলিত বিবাহ-সংস্কারকে সহজেই অস্বীকার করে তিনি জীবন সঙ্গিনী বেছে নিয়েছেন। বহির্ভারতে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সংযোগ, বিশেষ করে নিঃস্ব, রিক্ত, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে মানুষের অসহায়তার পক্ষে শারীরিক-মানসিক-ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ এই লেখককে তৎকালীন মূল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন করল। এতদিন সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ তথা সামন্ততন্ত্রের পক্ষে যে দুর্বলতা গ্রাস করেছিল শিক্ষিত নাগরিক চরিত্রকে, এই লেখক যেন সচেতন ভাবে এই দুর্বলতাকে চূর্ণ করবার জন্যে তাঁর সৃষ্টিকে নিযুক্ত করলেন। লেখক এটা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন ঔপনিবেশিক জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে না পারলে সার্থক সাহিত্যের অনুকূলে উপযুক্ত মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবেনা। তাই দেশের বৃহত্তর মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থেই তিনি নিজের স্বার্থকেও যুক্ত করে নিলেন। সাহিত্যের ডেস্‌ক ছেড়ে তিনি নির্দ্বিধায় রাজপথে নেমে এলেন। আমরা দেখলাম তাঁকে কুখ্যাত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ভলাণ্টিয়ারি করতে নেমে গেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নেবার পবিত্র সংকল্পে হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি। দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী। কংগ্রেসের বিপ্লবী অংশ, অগ্নিযুগের বীরদের প্রতি, এমনকি এদেশে সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছে।

সে সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় কবি নজরুল ছাড়াও আরেক জন লেখকের উল্লেখ করা কর্তব্য হবে। তিনি শরৎচন্দ্র-অনুরাগী এবং সমদৃষ্টি-

সম্পন্ন, যাকে সাম্রাজ্যবাদের নিগ্রহেই "প্রেম চান্দ" ছদ্মনামটি গ্রহণ করতে হয়!

"পথের দাবী" সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বীভৎস মূর্তিটিকে যে ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে তা সে কালের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃসাহসিক কর্ম। শুধু সাম্রাজ্যবাদী শোষণই নয়, স্বাধীনতার আন্দোলনে নন্‌-ভায়োলেন্স বা ভায়োলেন্স কোনোটিতেই শরৎচন্দ্রের এলার্জি ছিল না, তাই কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং কংগ্রেসের ঘোষিত প্রধান নীতি "অহিংস" হলেও তিনি মুক্তকণ্ঠে বিপ্লববাদকে সমর্থন করেছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনে শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মপ্রণালীকেও আন্দোলনের অংশবিশেষ বলে তিনি চিনিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নটিই যখন আলোচিত হচ্ছে তখন ইংরেজি ভাষায় লিখিত হলেও মুলক্ রাজ আনন্দের 'কুলি' ও 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'-শীর্ষক উপন্যাস দুটিকেও ঐতিহাসিক শর্তে মনে রাখতে হবে।

শরৎচন্দ্রেই প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ রাখা যাক।

একটি ঘটনা সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করছি। রাজনীতির ব্যস্ত মানুষ স্বয়ং গান্ধীজি সে কালে তাঁর সেক্রেটারি শ্রীদেশাইকে নির্দেশ দেন, অবিলম্বে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী গুজরাতি ভাষায় তর্জমা করবার জন্যে। কারণটা কী এই নয় যে, গান্ধীজি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের সংগ্রামী ভূমিকাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন?

পথের দাবীর কী ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশ্‌নার কলস্‌ন স্বয়ং লেখককে বলেছিলেন "শরৎবাবু, আপনি পথের দাবী লিখে আমাদের কী ক্ষতি করেছেন জানেন? আমরা যেখানেই বিপ্লবীদের ধরছি, সেখানেই দেখছি তাদের সকলের কাছেই একটি করে গীতা ও একটি করে পথের দাবী। আপনার পথের দাবী বিপ্লবীদের কী ভাবে মাতিয়েছে একবার দেখুন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীগত দুর্বলতায় পথের দাবীর ভূমিকাটাকে অস্বীকার করে' অবান্তর ইংরাজের 'সহনশীলতার' গুণকীর্তন করেছেন এবং বুদ্ধিমানের মতো এই গ্রন্থের দায়িত্ব শরৎচন্দ্রের উপর চাপিয়ে দায় সেরেছেন। একই কারণে নজরুল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার শিকার হয়ে কারান্তরালে গেলে কবি সে ভূমিকার গুরুত্ব পরিহার করে টেলিগ্রাম পাঠালেন: অনশন ধর্মঘট ছেড়ে দাও। আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়।

আরও বিস্ময়, শরৎচন্দ্র যখন পথের দাবীতে সব্যসাচীর জবানীতে বলেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত' শক্ত নয়, বোন।" তখন রবীন্দ্রনাথ "রায়তের কথার" ভূমিকায় জমিতে রায়তের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'বলশেভিজমের' গন্ধ পান। এবং হাস্যকর যুক্তিতে রায়তদের হাতে জমিদারি ছেড়ে দিতে ভরসা পান না।

শরৎচন্দ্র আরও স্পষ্ট করে বলেন, Permanent settlement এর জন্যই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middleman সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি!...জমি কেনা ও বেশি সুদে লগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাঙলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।"

বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারিতন্ত্র সম্পর্কে এই তাঁর সুস্পষ্ট মতবাদ। তাঁর সাহিত্যকর্মে এই লক্ষণই তাঁকে পূর্ববর্তী লেখকদের বিরুদ্ধবাদী করেছে। অথচ যার সম্পর্কে বঙ্কিমের মন্তব্য, আমাদের মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে। এই নির্ভরতা ভেঙে গেলে এতদিনকার সুপারস্ট্রাকচারের বনেদটাও ধ্বসে পড়ে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থই বৈপ্লবিক। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় কী ব্যক্তিগত জীবনে এর সঙ্গে আপস করেন নি। এমনকি গ্রামে বাড়ি তৈরি করলেও তথাকথিত মনীষীদের অনুকরণে জমিদারি কিনতে ঘৃণাবোধ করেছেন। শরৎ-সাহিত্যের এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আড়াল করবার জন্যে স্বাভাবিক কারণেই এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী লেখকের ভিন্ন মূল্যায়নের নামে অপব্যাখ্যাও করেন।

শরৎসাহিত্য-আলোচক কলেজের মাস্টার এমনও মন্তব্য করেন পথের দাবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব না কি শরৎচন্দ্র বুঝতে পারেন নি, না কি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের মতো ছিল না!

এই প্রশ্নটা নিয়েই আপাতত আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনে একবারই মাত্র সক্রিয় রাজনীতিতে স্বল্পায়ু হলেও অংশ নিয়েছিলেন। সেটা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উষালগ্নে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে এবং 'বিপ্লববাদ' চাড়া দিয়ে উঠলে কবি অচিরে আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষার

বিরুদ্ধে "জাতীয় শিক্ষা" প্রবর্তনের প্রয়োজনে যখন জাতীয় নেতৃত্ব ইংরাজের গোলামশালা থেকে ছাত্রদের বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তার তাৎপর্য না মেনে "শিক্ষার মিলনে" য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠলে শরৎচন্দ্র তার উত্তরে "শিক্ষার বিরোধ" রচনায় সাহসের সঙ্গে য়ুরোপীয় শিক্ষাসভ্যতার অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে তুলে ধরলেন। ইংরাজি শিক্ষা যে এদেশে সাম্রাজ্যবাদেরই সহায়ক হাতিয়ার ছিল এ কথা কী নতুন করে বোঝাবার প্রয়োজন রয়েছে? অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের মহান আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ ক্যাণ্ডিতে বসে 'চার অধ্যায়ে' যখন কলঙ্কিত করলেন, ঠিক সেই বছরে সূর্য সেন সাম্রাজ্যবাদের জল্লাদের হাতে আত্মবলি দিলেন। 'চার অধ্যায়' ঝটিতি সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা Asiaতে তর্জমা হয়ে গেল। শত শত কপি 'চার অধ্যায়' জেলখানায় পাঠানো হল বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙার জন্যে।

এই হল কবির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যা শরৎচন্দ্র অনুধাবনই করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় অভিযোগ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান নায়ক-নায়িকা জমিদার। যদিও পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে এ-অভিযোগ ধোপে টেঁকেনা। 'প্রেমিক' জমিদার বা জমিদার নন্দনই হোক তাদের বড়লোকি যে প্রজার শোষণে গড়েওঠা এ-সত্যকে তিনি গোপন করতেও চেষ্টা করেন নি। ইতস্তত এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচ্যুতি যদি কোথাও ঘটে থাকে তার জন্যে একা শরৎচন্দ্রকে দায়ি করা চলেনা, মনে রাখতে হবে জমিদারি-প্রভাবিত যে পিছুটান মধ্যশ্রেণীর সমাজ-বিন্যাসকে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রেখেছে শরৎচন্দ্র একক-চেষ্টায় তার সর্বগ্রাসী সংক্রমণ থেকে মুক্ত হবেন, এমন চিন্তা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যায়!

তৃতীয় অভিযোগ, শরৎচন্দ্রও বঙ্কিমের মতো বিধবা বিবাহ দিতে পারেন নি। এ-ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রের যুক্তি স্পষ্ট, সমাজকে আঘাত দিয়ে সমাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে যদি এ বিবাহ না ঘটে তাহলে কলমের ডগায় তিনি হাজার বিধবা বিবাহ দিলেও তা সার্থক হবে না। সামাজিক স্বীকৃতির দৈন্যে রমা-রমেশের যে বিবাহ হতে পারল না তার ফলে দুটো মানুষের জীবনই নয়, একটা পল্লীসমাজের গৌরবময় সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে গেল।

চতুর্থ অভিযোগ, শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

তাই তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি ব্রাহ্মণ। কথাটা উল্টো করে বললে কী এই বোঝায়না যে, হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলি তথাকথিত ব্রাহ্মণেরাই ধরে রয়েছে, সেই চরিত্রগুলির মাধ্যমেই শরৎচন্দ্র গোটা হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন? প্রতিহিংসাপরায়ণ সমাজ শিরোমণিদের একযোগে লেখককে আক্রমণ কী এটাই প্রমাণ করেনা যে, লেখকের লক্ষ্য সঠিক ছিল?

বিরুদ্ধবাদীদের এই সকল অভিযোগের ফাঁদে পা দিয়ে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। উপরন্তু সচেতন পাঠকের গ্রহণক্ষমতার প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস।

শরৎচন্দ্রের সচেতনতা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততান্ত্রিক স্ট্রাকচারের উপরই নিবদ্ধ রইল না, তজ্জ প্রতিক্রিয়াজাত সুপারস্ট্রাকচারের দিকেও তিনি কামান দাগলেন। পথের দাবীর পর তাঁর প্রধান সাহিত্য কর্ম 'শেষ প্রশ্ন'। এখানে তিনি আমাদের সনাতন ধ্যানধারণাপুষ্ট চিন্তার গতানুগতিকতাকে সঠিকভাবে ঘা মারতে শুরু করলেন। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, আশ্রম, অধ্যাত্মসাধনা, মায় সতীত্ব, একনিষ্ঠ প্রেমজাতীয় ভারতীয়-লেবেল-মারা জগদ্দল ভাববাদী চর্চাকে নস্যাৎ করে যুক্তিনিষ্ঠ, গতিশীল বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন। ভাববাদের বিরুদ্ধে শেষ প্রশ্নের এই তাত্ত্বিক যুক্তিনিষ্ঠা স্বভাবতই ঐতিহ্যপন্থী, রক্ষণশীলদের মনঃপুত হয়নি। সমালোচকরা প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলেন, শেষ প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার অপহ্নুতি ঘটেছে। কোনো কাহিনী নেই, কমল শুধু কথাসর্বস্ব, তার কথায়-আচরণে মিল নেই, ইত্যাদি। মূর্খেরা বোঝেনা 'শেষ প্রশ্ন' একটি তত্ত্বমূলক গ্রন্থ, কাহিনী-রচনায় পটু লেখক এখানে তথাকথিত বর্তুল কোনো কাহিনী বুনতে চেষ্টা করেন নি। 'বিপ্লবিনী' কমল যেটুকু ছুঁৎমার্গ দেখিয়েছে সে কনসেশনটুকু না-দিলে এ-গ্রন্থ তথাকথিত ভদ্দরলোকদের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারত না! এই ছিদ্রান্বেষী ভদ্রলোকদের লেখক ভালো করেই চিনতেন। এ যেন ধর্মের রসে বুঁদ ভারতীয় জনসাধারণের মন কাড়বার জন্যে গান্ধীজীর রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশানোর কৌশল।

অথচ এ-কনসেশনটুকু দিয়েও শরৎচন্দ্র তার উদ্দেশ্য হাঁসিল করে নিয়েছেন।

'পথের দাবী' যদি রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে তাহলে 'শেষ প্রশ্ন' একজাতীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নান্দীমুখ।

ধর্ম-আশ্রম-অধ্যুষিত দেশে এই বদ্ধমূল সংস্কারগুলোকে আঘাত করা যে কী বৈপ্লবিক কাজ, তা সবাই স্বীকার করবেন। কারণ এরি উপর আমাদের সমাজচিন্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই নতুন ঐতিহ্যসৃষ্টিকারী সারস্বত সাধনার কারণে শরৎচন্দ্র প্রথমাবধি সমাজের তরুণ সম্প্রদায়কে তাঁর পাশে পেয়ে গিয়েছিলেন, বিপ্লবী যুবগোষ্ঠী তো বটেই, এমনকি ছাত্র দলকেও।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধারণার বিপরীতে সেদিন যে নতুন শক্তিমান সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল শরৎচন্দ্র স্বাভাবিক কারণেই তার সারথ্য গ্রহণে উৎসুক হন। কারণ এঁদের সত্য সাধনাই তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এমন আশা তাঁর ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শরৎচন্দ্রের একক চেষ্টায় যে যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদী সাহিত্য ঐতিহ্য গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেদিনকার নতুন সাহিত্যিকগোষ্ঠী দেশের বৃহত্তর সমস্যাকে উপেক্ষা করে' যখন উদ্ভট দেহসর্বস্বতায় মেতে উঠলেন তখন শরৎচন্দ্র নৈরাশ্য বোধ করেছিলেন। ফলে শরৎচন্দ্রের একক চেষ্টায় যে বস্তুবাদী ধারা গড়ে উঠতে চাইছিলো, পরবর্তী লেখকদের ফ্যাশান-সর্বস্বতায় তা আবার ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। সাহিত্যের পুরনো ঐতিহ্যই আবার সমাজ শরীরকে জরদ্গব করে তুলল।

'বঙ্গবাণীতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত পথের দাবীর প্রেস কপিতে ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২-এ শরৎচন্দ্রের মন্তব্য কম ঈঙ্গিতবহ নয়। তিনি লিখেছিলেন, "পথের দাবীর দ্বিতীয় ভাগ আমি যদি সম্পূর্ণ করতে না পারি আমার দেশের কেউ যেন পারে এই কামনা করি।"—শ

শরৎচন্দ্রের এই অসমাপ্ত কাজের ভার কী কেউ নিলেন ?

যে-শরৎচন্দ্র মন্তব্য করলেন 'গর্কির লেখা পড়লে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে আসে' এবং যিনি বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যত রাশিয়ান সাহিত্যের মতো নীচুতলার মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, সে-আশ্চর্য বাস্তব ইঙ্গিতটিও কী কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেদিন ?

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণকালে জানি না কোন্ কারণে অসুস্থ গর্কিকে দেখবারও সময় করতে পারলেন না! অবশ্য ১৯৩০-শে রাশিয়া ভ্রমণের আগেই ১৯২৪-এ "পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারির" পরিশিষ্টে ২৭ সেপ্টেম্বর গর্কির "টলস্টয় স্মৃতি" সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে কটাক্ষ

করেছেন "...গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন করে বলব? গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত।" আসল ব্যাপার গোর্কির "সর্বহারার মানবতাবাদ" রবীন্দ্রনাথের "শ্রেণীসমন্বয়বাদের" সঙ্গে মেলেনি। জনৈক রবীন্দ্র গবেষক ১১ জুলাই ১৯৩৬ ভবানীপুরে আশুতোষ হলে গর্কির স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রেরণের ঘটনায় কী প্রমাণ করতে চেয়েছেন তিনিই জানেন। গবেষক যথাযথ বাণীটি উদ্ধৃত করে দিতে পারলে আমাদেরও অনেক পণ্ডশ্রম বাঁচত! "কবিগুরু" রুডিয়ার্ড কিপলিঙের মৃত্যুতেও বাণী পাঠিয়েছেন যার মধ্যে কিপলিঙের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের পরিচয় নেই! অথচ রাজনীতিক ও কবি সরোজিনী নাইডু সে সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটিরও উল্লেখ করতে ভোলেন নি!

প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

১৯৩৮-এর গোড়া থেকেই ভীষণ অসুস্থ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জীবন খণ্ডিত হল। ১৯৩৮-এ তাঁর জীবনাবসান ঘটল।

ব্রিটিশ শাসন ও মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য

পরিশ্রমী পাঠক বাঙলা সাহিত্যের দিকে একবার মনোযোগী দৃষ্টি দিলে যে-দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর চোখে পড়বে তা হচ্ছে আমাদের প্রধান সাহিত্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি যেমন বিরুদ্ধতা নেই তেমনি নেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা।

অথচ দীর্ঘকাল এই দুটি শক্তিই এ দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথা সামাজিক শোষণের মূল। এবং প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না এই শোষণের বিরুদ্ধে বারবার নিপ্পেষিত মানুষ বিদ্রোহ করেছেন, বিক্ষোভ করেছেন। তা যতই স্থানিক বা আঞ্চলিক হোক সে গণআন্দোলন! অর্থাৎ এই বিদ্রোহগুলিই প্রমাণ করে এই শোষণের যন্ত্রটি সম্পর্কে জনমানস সচেতন ছিল। প্রায় গোটা উনিশ শতক মূলত কৃষক-সংশ্লিষ্ট এই আন্দোলনের দ্বারা রক্তাক্ত।

এই যদি বাস্তব অবস্থা হয় তাহলে প্রশ্নটি সঙ্গিনের মতো উদ্যত হতে বাধ্য, কেন আমাদের প্রধান প্রধান সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারিপ্রথার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক জেহাদ নেই!

এই প্রশ্নের চাবি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের মতে, "বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।" [রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৫১৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভব না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।" [বঙ্গদেশের কৃষক, ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৮৪]

এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সত্যদ্রষ্টা। বঙ্কিম এগিয়ে এসে পুরো ব্যাপারটাকেই ফাঁস করে দিয়েছেন।

তাঁরা যে বঙ্গসমাজের কথা বলেছেন, যা সম্ভব হয়েছে ইংরাজের আগমনে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে, যাকে ঐতিহাসিক পরিভাষায় "মধ্য শ্রেণী" আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার অস্তিত্ব ইংরাজ-সমর্থনে তথা জমিদার ও মধ্য-স্বত্বভোগীর প্রশ্রয়ে, সেই বিশেষ শ্রেণীর জন্যেই 'ভারত-পথিক' রামমোহন পথ তৈরি করে গেছেন। যে-পথে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারি-প্রথার সঙ্গে সংঘর্ষের কথা ওঠেই না।

সমস্যাটা হয় যখন এই শ্রেণীগত ধারণা নির্বিশেষে আপামর দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। যেহেতু এই ইংরাজি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর দর্শন 'অ-শিক্ষিত' জীবন ও জীবিকায় জর্জরিত অসন্তুষ্ট মানুষ গ্রহণ করেননি।

এমন কেন হয়? এর চমৎকার উত্তর: শ্রেণী-অধ্যুষিত সমাজে ইতিহাস সর্বদাই ক্ষমতাবান শাসকবর্গ ও তার সহযোগী শ্রেণীর ইতিহাস।

রামমোহন থেকেই আমাদের মধ্যশ্রেণী এই ইতিহাস রপ্ত করে উত্তরাধিকার সূত্রে বহুদিন তার পতাকা বহন করে চলেছে।

পলকে প্রণয় কথাটা কী পরিমাণ সত্যি তা উনিশ শতকের বাঙালী ভদ্রলোকদের দেখেই বোঝা গেল। কোম্পানির শাসনভার গ্রহণ করার কালেই তাঁরা বুঝে ফেলেছিলেন ইংরাজ-শাসন এদেশে বিধাতার আশীর্বাদ এবং আমাদের সাবালক করার প্রয়োজনে প্রভুদের দীর্ঘকাল এদেশে থাকা উচিত। কারণ? কারণ মুসলমান শাসন অত্যন্ত বর্বর এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন ইত্যাদি। যে 'হিন্দুদের' জন্যে এই সুপারিশ সেই বিত্তবান্ হিন্দুরা কিন্তু মুসলিম আমলে সরকারের ফিনান্‌সিয়ার হিসাবে সরকারে এতাবৎকাল যথেষ্ট প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি খাটিয়েছে। মুসলিম শাসনে হিন্দুদের 'দুর্গতির' যে লোকপ্রিয় প্রবাদ রয়েছে তার মূলে সরকারি কর ফাঁকি দেবার অপচেষ্টাটা ঢাকা দেবার কৌশলটুকুও কাজ করছে। কারণ সরকার ইসলামই হোক কি ইংরাজই হোক হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র মানুষ নির্বিশেষে একই ভাবে বঞ্চিত। বিত্তবান্ হিন্দু-মুসলমান বিত্তহীন মানুষদের কথা কোনোকালেই ভাবেনি।

এই বিত্তবান্ হিন্দু ফিনানসিয়ারদের উজ্জ্বল প্রতিনিধি জগৎশেঠ, যে-বেনিয়াটি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজের সঙ্গে চুক্তি করে নবাবকে ফাঁসিয়ে দিতে পেরেছিল। ইতিহাসে যার নাম পলাশীর যুদ্ধ।

বিশেষ করে বাঙালী ভদ্দরলোকেরা যখন মুসলিম শাসনের নিন্দা করেন

তখন ব্যাপারটা বেশ মজাদার হয়ে ওঠে। এ কথা ঠিক ভারতে তখন মুঘল শাসনের ক্ষয় শুরু হয়েছে, যদিও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও মুঘল শাসন ব্যবস্থা একেবারে শেষ হয়ে যায় নি এবং তখনো এই বাঙলা দেশ সমৃদ্ধির চূড়ায় বাস করছে, এমতাবস্থায় বাঙালী "হিন্দুরা" খামোখা বাঙলা দেশের শাসন সম্পর্কে কেন নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে বিদেশী শাসনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন তার কারণ বোঝা কী খুবই কষ্টকর ?

এই হচ্ছে বেনিয়াদের চরিত্র, যখন যে শাসকগোষ্ঠী আসে তখন তারা তাদেরই সহযোগী হয়ে ওঠে। দিল্লির মুঘল বাদশাহের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা এবং ইংরাজ বণিকদের একেকটি করে বাণিজ্যকেন্দ্র দখল, সেনাবাহিনী ও দুর্গ নির্মাণ এবং আরো বেশি করে বাণিজ্যের কর্তৃত্বের জন্যে অবশ্যম্ভাবী শাসনভার দখল করার হিসাবটা ইংরাজের সঙ্গে এই হিন্দু বেণিয়ারাও বুঝতে পেরেছিল। তাই আগে ভাগেই তারা ইংরাজের সমর্থক 'বেরাদার' হয়ে যেমন যেমন প্রভু একেকটি প্রদেশ দখল করেছে বাঙালী ভদ্দরলোক তার জুনিয়ার পার্টনার হয়ে সে সে প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা ভারতের মানুষ সাহেব প্রভুদের সঙ্গে এই বাঙালী নেটিভ বাবুদেরও তাদের হুজুর বলে চিনেছে।

ইংরাজি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর মানসিকতার চেহারাটা যদি এই হয় তাহলে এই শ্রেণী-জাত লেখকদের সাহিত্য-ধারণা স্বাভাবিকভাবে এমনটিই হবে। এ দেশের বৃহত্তর মানুষের পাইকারী অশিক্ষার কারণে সাহিত্যের হাটে লেখক তথা পাঠকের চৌহদ্দি তথাকথিত মধ্যশ্রেণী। যাদের চরিত্রে ইংরাজের প্রতি নিঃশর্তে দাসখত এবং টিকে থাকার জৈবিক তাড়নায় জমিদার কিংবা মধ্য-স্বত্বভোগীর অনুগ্রহে গাঁটছড়া বাঁধা।

আমাদের প্রধান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজ শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের কারণেই ইংরাজ-বিরোধিতার বিষয়টি চিন্তাও করতে পারেননি! এমন কি মধ্য শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে কেউ যদি সামান্য সংসাহসও দেখাবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার বিরূপতা করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ কিংবা মুশারফ হোসেনের জমিদার দর্পণ সাহিত্য সম্রাটের অনুমোদন পায় নি। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণীতে তিনি সজ্ঞানে জনগণের ইতিহাসকে ধর্ষণ করেছেন। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই বঙ্কিমই তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' নিবন্ধগুলিতে জমিদারি শোষণের অন্যায়কে ধরিয়ে দিয়েও শ্রেণীস্বার্থে জমিদারেরই নুন খেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথও একই কারণে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'সহিষ্ণুতার' প্রশংসা করেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিক খ্যাতির সুনামকে খর্ব করে ১৯১৫-তে সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় নাইট উপাধি গ্রহণ করতে পারলেন। ১৯১৭-১৮-তে তাঁর প্রিয় থিসিস "ছোট ইংরেজ বড় ইংরেজ"। এমন কি ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি ভাইসরয় লর্ড চেমসফোরডকে উপসংহারে লিখছেন: "...রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার শ্রদ্ধা আছে।...বড় দুঃখই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।" [প্রভাতকুমার। রবীন্দ্র-জীবনী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০] জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরও রবীন্দ্রনাথের এদেশের ইংরাজ শাসকদের চরিত্র সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়নি! ১৯৩১-এ হিজলী জেলে গুলিচালনার বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত ভাষণে পুনরায় জানিয়েছেন "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে"। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র যে সর্বসময়ই এক, এটা জানা সত্ত্বেও কবি বারবার এক মায়ার মধ্যে আটকে পড়েন। একই কারণে শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে দুঃসাহসিক মুখোশ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেখানে তাঁর সমর্থন মেলেনি। বরং পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তুলনায় ইংরাজ যে কত ক্ষমা ও সহনশীল তার পক্ষে ওকালতি উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানতেন ইংরাজ তার শাসনের শৈশবেই তথাকথিত বাঙালী ভদ্দরলোকদের মস্ত সমর্থক পেয়ে ক্রমে সারা ভারতে তাদের শাসনরূপী শোষণের জাল ফাঁদতে পেরেছিলেন। ১৭৫৭-তে এই বাঙলার মাটিতেই পলাশীর যুদ্ধ নামক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কাজেই প্রথম থেকে এ দেশে বাঙালী নামক ভদ্দরলোকরা ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় বাধা দেয়নি। কাজেই বঙ্গদেশে সাম্রাজ্যবাদী নখদন্ত তেমন করে প্রকটিত হবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙলা দেশই তো সেদিন সারা ভারতবর্ষের ক্লীবত্বের চেহারা ছিল না! রবীন্দ্রনাথ জীবনে একবারই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেটা

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। কিন্তু সেই আন্দোলন যখন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করল তখন রাজনীতিবিমুখ কবি সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে কোটরবাসী হলেন!

এই হল কবির সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মনোভাব। অন্যদিকে জমিদারি ব্যবস্থার বিপক্ষেও যে তিনি যেতে পারেন নি তার কারণ তিনি "ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি-অধিকারকে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক" বলে মনে করতেন। [প্রভাতকুমার/রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৭] বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি পিতার সুযোগ্য নির্বাচন। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা জমিদারি রক্ষণের ব্যাপারেও যে-অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রমাণ রেখেছে যার জন্যে শুধু শিলাইদহ নয়, কুষ্টিয়া, উড়িষ্যার সমূহ জমিদারির দেখাশোনার ভার তাঁর ওপর বর্তেছিল। মহর্ষি জমিদারির ব্যাপারে অন্য পুত্রদের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কিংবা প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র ভূমিকা লেখার কালেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ছাড়ার কথা ভাবেননি। সোভিয়েত তীর্থভ্রমণের অব্যবহিত পরেই কবি আমেরিকায় ধর্না দিয়ে বসলেন রকফেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাধের শান্তিনিকেতনের জন্যে কিছু অর্থভিক্ষার আশায়! বলাবাহুল্য রকফেলার তাঁকে নিরাশ করেন! অন্যদিকে রায়তের কথার ভূমিকায় তিনি কার হাতে জমিদারি ছেড়ে দেবেন এই দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত। কারণ লোভী রায়তরা নিজেরাই একেকজন রক্তচোষা জমিদারে পরিণত হবে!

শরৎচন্দ্রে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারির বিরুদ্ধে একটি সঠিক বস্তুবাদী দৃষ্টির উন্মেষ দেখা যায়। জমিদাররা যে প্যারাসাইট, কৃষকদের দুর্গতির মূল জমিদার শ্রেণী একথা সঠিক জেনেও মধ্য শ্রেণীর মানসিকতার যে সর্বগ্রাসী আকর্ষণ, বিশেষ করে জমিদারশ্রেণীর প্রতি দুর্বলতা, তার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত হতে তিনি পারেননি।

শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার সেকালে বহন করেছিলেন আরেকজন লেখক। তিনি প্রেমচন্দ।

সিপাহী বিদ্রোহ ও সেকালের বাঙালী ভদ্রলোক

সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে কলকাতায় ইংরাজ অধিবাসীরা প্রথমটায় সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাত্রিবেলা তারা ভয়ে ভয়ে জাহাজে আশ্রয় নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করত।

ইংরাজদের এই আতংকিত অবস্থা দেখে "বাঙালী নেতৃবর্গ" গুরুতর কর্তব্যবোধে তাঁদের বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ প্রকাশ্যে সভা-সমিতি করে এবং প্রস্তাব পাঠিয়ে শ্বেতাঙ্গদের নিরুদ্বেগ করবার চেষ্টা করেন।

"বিশ্বস্ত নাগরিকদের" সভা ডাকা হল "হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের হল্‌ঘরে।" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব পাশ করলেন। রাজা বাহাদুর রাধাকান্ত দেব ১৮৫৭-এর ১৫ মে "নেটিভ সমাজের একটি সাধারণ সভা" ডাকলেন। ইংরাজি প্রস্তাবের তর্জমা ছাপানো হল এবং জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভারত সরকারের সেক্রেটারি সমীপে ১৮৫৭-এর ১৩ মে পাঁচ দফায় আনুগত্য জানিয়ে প্রস্তাব পাঠালেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ভি. পি. প্রতাপচন্দ্র সিংহ, প্রমুখ। সেই প্রস্তাবও যথারীতি বাংলায় তর্জমা করে ছাপিয়ে সাধারণে বিলি করা হল।

এছাড়াও উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, কোতরঙ, কোন্নগর, এবং সন্নিহিত পল্লীর জমিদার, তালুকদারগণ হুগলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে তাঁদের বিশ্বস্ততার স্মারক পত্র পাঠালেন। এই স্মারকপত্রের স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ছিলেন উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য ভূস্বামী জয়কৃষ্ণ মুখুজ্যে। এঁরা অধিকন্তু স্থানীয় অঘোরী, গোয়ালা, বাগদি, ডোমদের নিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবার পরামর্শ দিলেন। যাদের কর্তব্য হবে পলাতক বিদ্রোহী সিপাহীদের মোকাবিলা করা। সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইংরাজদের সমর্থন করে আরো সভা-সমিতি শুরু হল। বালীদেওয়ানগঞ্জ, বাঁকুড়া, নোয়াখালি, সিলেট, রাজশাহী, শান্তিপুর তথা কলকাতাতেও। কলকাতার দুটি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন পর্যন্ত ইংরাজকে সমর্থন জানাল।

বর্ধমানের মহারাজা রাধাকান্তদেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং আরো ২৫০০ বঙ্গসন্তান লর্ড ক্যানিঙের কাছে তাঁদের প্রস্তাব পাঠালেন।

তৎকালীন ভারত সরকারের সেক্রেটারি সিসিল বীডন উত্তরে লিখে পাঠালেন। "If peace, order, and security are valuable to any, they are so to those who, like the foremost among you, hold high rank, large hereditary possessions, accumulated wealth and respected social positions."

এই উক্তিই সেই সময়কার "নয়া ধনীদের" চিত্র তুলে ধরেছে! অন্য এক প্রস্তাবে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় তথা "৫০০০ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার" নেটিভ যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজা-জমিদার-তালুকদার-বণিককুল, লর্ড ক্যানিঙের কাছে যথোচিত সমর্থন পাঠালেন।

এছাড়াও উৎসাহী ইংরাজ সমর্থকদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে শ্রীরামপুরের গোঁসাইদের, কলকাতার শ্যামচরণ মল্লিক, (এঁর হাতে ছিল প্রচুর সরকারী ঋণপত্র), কুমিল্লার বংশীলোচন মিত্র, কলকাতার শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ভুলোয়ার রাজা, তাঁদের নায়েব যশোদাকৃষ্ণ পাইন, প্রাণকৃষ্ণ ও জগৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, পাণিহাটির জমিদার, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুর্শিদাবাদের নবাব, আনন্দকিশোর রায়, ঢাকার জমিদার, ঢাকার মৌলভী আলী ও আবদুল গণি, রামচন্দ্র, ময়মনসিংহের জমিদার, প্যারিমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ।

শেষোক্ত জন "জঙ্গী মুন্সেফ"। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" কাগজে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়:

"Take the most timid quaking wretch of a kayust (kayastha) you can find, put him in any district in India with a shadow of authority, and if he does not make Punjabee and Sikh, Marhata and Hindusthanee, work themselves to death for his benefit, and think all the while it is for their own, he is no true Bengali."

বাঙালী "ভদ্রলোকদের" এই চরিত্র দেখলেই বোঝা যায় কেন এই শ্রেণী সেকালে বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থন করেননি। ইংরাজ প্রভুকে সর্বপ্রথম এঁরাই "বিধাতার আশীর্বাদ" বলে গ্রহণ করেছেন। কারণ বিধাতাধন্য

শ্বেতাঙ্গপ্রভুদের সহবাসেই তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে ভূস্বামী শ্রেণী এবং তারই আশ্রয়ে পুষ্ট হতে শুরু করেছে "মধ্যশ্রেণী"।

ইংরাজ-বিরোধিতার অর্থ তাঁদের সৌভাগ্যের পতন। কারণ শুধু জমিদার হিসেবেই নয়, নতুন মধ্যশ্রেণী ইতিমধ্যেই ব্যবসা এবং চাকরির ক্ষেত্রে ইংরাজের জুনিয়ার পার্টনার হয়ে গেছে।

ইংরাজদের জন্য এই নির্লজ্জ ওকালতি "বিদ্রোহীরা" সেকালে ক্ষমা করেননি। বেরিলিতে বাঙালীদের প্রতি সিপাহীদের ঘৃণা এত দুর্বার হয়ে উঠেছিল যে অনেককে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। সেকালে ফারাক্কাবাদ বা কানপুরে ইংরাজদের মতনই বাঙালী বাবুরা বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে (১৮৫৭-এর এপ্রিল-মে) সিমলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও অস্বস্তির মধ্যে কাটাতে হয়।

সম্ভবত এই সকল কারণে সুভাষচন্দ্রকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়, উনিশ শতকে বাঙালী দেশটাকে ইংরাজদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল, বিশ শতকে তাই তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

সিপাহী বিদ্রোহে যে বাঙালী ভুল করেছিল সে কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করে গেছেন।

কৌতুকের বিষয় বহু যুগ পরে আজো পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর অভাব নেই যাঁরা সিপাহী বিদ্রোহে তৎকালীন বাঙালীর ভূমিকাকে যুক্তিপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন। কারণ তাঁরাও বিশ্বাস করেন ঘটনাটি একটি নিছক সিপাহী বিদ্রোহ এবং মুঘল বাদশাহকে ফিরিয়ে এনে ইংরাজ আনীত আধুনিক যুগকে মধ্য যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বেশির ভাগ বাঙালী ঐতিহাসিকগণও এই মতের সমর্থক। যদিও বাস্তব ঘটনা আলাদা। বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে প্রথম শুরু হলেও অনতিকালেই তা কৃষক ও নিম্ন বর্গের সাধারণ মানুষের যোগদানে একটি জনপ্রিয় অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এই অভ্যুত্থানে শামিল হয়। এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ পরবর্তীকালে ইংরাজের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার শিকার হয়।

এই বাস্তব ঘটনা বিস্মৃত হলে আমরা অবিচারই করব।

বর্তমান সমাজ ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকবৃন্দ

একবার এক সাহিত্যসভায় প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সবিনয়ে স্থানীয় প্রবীণ ভদ্রলোক আমাকেই প্রশ্নটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন, "দেশে কী এমন একজন সাহিত্যিকের নাম করতে পারেন যাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধা করা যায়?"

সাহিত্য-পরিবারের সামান্য সভ্য হিসেবে সেদিন আমতা আমতা করে কী জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই। তবে স্বীকার করতে লজ্জা নেই মূল প্রশ্নটি আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

বস্তুত ভদ্রলোকের প্রশ্নটি প্রায়শই আমাকে কাঁটার মতো বিদ্ধ করতে থাকে। কারণ লেখক হিসেবে কোনো পাঠকের চোখেই অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠা অত্যন্ত বেদনাদায়ক নিশ্চয়ই।

এই দুর্মূল্যের বাজারেও প্রতি মাসেই যে পরিমাণ উপন্যাস-সাহিত্য প্রকাশিত হয় তা আমাদের গরিব দেশের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহজনক। এবং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এরি মধ্যে দু চারজন লেখক যে বিক্রির রেকর্ড বজায় রেখেছেন সে ঘটনাও কম আহ্লাদের নয়।

তবে উল্লিখিত জিজ্ঞাসুর সাহিত্য-ব্যাপারটি সম্পর্কে এমত নারাজ হওয়ার হেতু কী, পরিষ্কার নয়।

তিনি কী সাহিত্যকর্মের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিজীবনটাকে নিয়েও অনর্থক নাড়াচাড়া করতে চান? স্থূল জীবিকার গরজে লেখক যে চাকরিই করুন আর যেখানেই করুন সেদিকে কটাক্ষ করার কোনো অর্থ আছে? লেখকেরা যদি নিরাপদ সাচ্ছন্দ্যের কারণেই বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর স্বার্থেই সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করে কলমবাজী করেন সেটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। নিশ্চয়ই সেখানে লেখকের ব্যক্তিগত আদর্শবাদের স্থান নেই।

আসল কথা ভাড়াটে সাংবাদিক সত্তার সঙ্গে শিল্পিসত্তার মিল খুঁজতে চাওয়াটাই অন্যায়। কে অস্বীকার করবে এই সমাজের জীবিকার প্রশ্নে অনেককেই আপস করতে হয়। একে বুর্জোআর "দালালি" বলে গালি-গালাজ করাটাও রুচিহীনতার পরিচায়ক।

ধরা যাক লেখকেরা পশ্চিম বাঙলার সাধারণ নির্বাচনের অবর্ণনীয় জালিয়াতির ব্যাপারে নিশ্চুপ, জেলে পিটিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের নির্মম হত্যার ব্যাপারেও নির্বাক, সাধারণ মানুষের খাদ্য বাসস্থান চাকরি, পর্যন্ত ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রশ্নেও মৌনীবাবা।

কিন্তু আবার দেখুন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি বিষয়ে মার্কিনী গণতন্ত্র তথা সাংবাদিক দায়িত্ব সম্পর্কে এঁরাই কেমন উচ্চকণ্ঠ। এমনকি দেবব্রত বিশ্বাসের মতন খ্যাতকীর্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকে 'ভাতে মারার' ব্যাপারেও কেমন অতন্দ্র। স্বেচ্ছাচারী মালিকপুত্রের চাঁদির জুতো খেয়েও এঁরা সপ্তাহে একবার করে স্বনামেই কলম ধারণ করে অর্ধপক্ক শিক্ষার ঢেকুর তোলেন। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুর পাণ্ডিত্যের কেশাগ্র স্পর্শ করবার হুতোমি নৃত্য জুড়েন।

দোষগুণ সমস্ত ব্যাপারেই থাকা সম্ভব, কিন্তু তাকে বড় করে দেখাটা আরেক ধরনের উচ্চমন্যরোগ।

ব্যক্তি-চরিত্র টেনে এনে লেখককে মদ্যপ, রমণী-আসক্ত বলে প্রচার করারও মানে নেই। শিল্পীদের এই "স্বাধীনতা" দিতেই হবে। কারণ স্রষ্টাদের সৃজনক্ষমতাশূন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক ছাঁচে ফেলা যায় না।

কী বলবেন? সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা? সাহিত্যিকের একমাত্র পবিত্র দায়িত্ব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। সেটা পূর্ণ হলেই যথেষ্ট। আপনি নিশ্চয়ই সাহিত্যিকের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের তুলনা করবেন না। রাজনীতি সাহিত্যকে নষ্ট করে। কী বলছেন? দেশের নব্বুই ভাগ লোকের জন্যে লেখা? আহা, জানেন আজো দেশের কত পার্সেণ্ট লোক অশিক্ষিত? যেমন খদ্দের হবে তেমনি তো মাল কাটবে? বই যারা কেনে তারা তো মুষ্টিমেয়।

ভদ্রলোক সাহিত্য-সম্পর্কিত বিষয়টাই গোলমাল করে ফেলছেন। ব্যক্তিজীবনে একটা লোক বেশ্যাসক্ত হতে পারে, মদ্যপ, গুপ্তচর, জালিয়াতও হতে পারে (এই সমাজেরই সৃষ্টি), তার জন্যে সে লেখক হতে পারবে না এমন বাঁধাধরা হলফনামা দেশে-বিদেশে সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও নেই।

আমি জানি এই অকাট্য প্রামাণিক যুক্তিকে ভদ্রলোক নস্যাৎ করতে পারবেন না যদি তিনি ভদ্রলোকই হন। সমারসেট মম, স্টাইনবেক, মুট হামসুন, ও হেনরি এমনধারা বহু নজিরই তোলা যায়। আর, মদ-মেয়েমানুষ

ব্যতিরেকে একটা লেখক "প্রেরণা-ই" বা কোথায় পাবেন ? এঁদের কথা ভেবেই তো ম্যাকসিম গর্কির 'queer people' নাটকটি লেখা।

এবার আসুন এঁদের সৃষ্টিকর্মের বাজারে। আহা, উপন্যাসে "মেয়েমানুষ" থাকবে না ? আর মেয়েমানুষ থাকলে "যৌনতা" থাকবে না ? আর, যৌনতা থাকলে "বলাৎকার" ঘটবে না ?

কী বলছেন ? কী মুশকিল, একটা শক্ত সমর্থ বেকার যুবক তার চাকরি না পাওয়ার উদ্বৃত্ত এনার্জি খরচের জন্যে নিদেন খালাসিটোলায় মদের ভাঁড় (বেকার বললেন, পয়সা পাবে কোথায় ?) এবং নার্সের ব্রা-র হুক (পয়সা) খুলতে যাবে না ? আরে মশায়, ইদিপাস কমপ্লেক্স শোনেন নি ? এতো নিছক স্বপ্নে গর্ভধারিণীর সঙ্গে সহবাস।

"সমাজবিরোধীর" কথা কেন ? পুলিশই বা অশ্লীলতার অভিযোগে জেলে পুরতে যাবে কেন ? জেল এমনিতেই বাড়ন্ত নয় ? জানেন, ববি মহানগরীর নাকের ডগায় "সর্বসাধারণের" সার্টিফিকেট ঝুলিয়ে রাজকাপুরকে ডুবন্ত থেকে ভাসমান করে তুলেছে ! ক'লাখ টাকার চাঁদাও তুলে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জনকল্যাণ তহবিলে।

দেখুন, আপনি যারপরনাই রেগে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ক্রোধ চণ্ডাল। (রামকৃষ্ণের কাছে চণ্ডাল অস্পৃশ্য কেন, জানি না)। কোনো বিবেচক লোকই সাহিত্যের পদ্মবনে পুলিশের মত্তহস্তীর আগমনকে স্বীকার করবে না। তাহলে "স্বাধীন শিল্পী" বলে কী রইল ? সাহিত্যের প্রশ্নে একমাত্র বিচার্য good art bad art, শ্লীলতা-অশ্লীলতার ব্যাপার নয়।

কী বলছেন ? হ্যাঁ পুলিশ এদের একদিন ধরেছিল। তাতে কিছু প্রমাণিত হল না। এঁরা যে এখনো এসব স্বাধীনভাবে লিখে যাচ্ছেন তাতেই কী প্রমাণিত হল না পুলিশ এঁদের চিনতে ভুল করেছিল ! এঁরা খাঁটি মাল বলেই এঁরা না-পুলিশ না-সরকারের স্পর্শের বাইরে।

আপনি বলবেন এগুলি সমাজের প্রতিনিধিমূলক চিত্র নয়। আপনাকে বোঝানো যাবে না। আপনি জেগে ঘুমোচ্ছেন মশায়।

স্পষ্ট করে বলি : সমাজে বলাৎকার নেই ?

আপনি কোন্ হরিদাস পাল। কেন আপনার মেয়েকে কলেজে পাঠিয়ে বাড়ি ফেরার সময় পর্যন্ত আপনি উদ্বেগে কাটান ? বালিগঞ্জ স্টেশনে ছোঁড়ারা কী করল সেদিন ? দমদমে, বরানগরে ?

ছিনতাই, রাহাজানি হচ্ছে না? ভেজাল গয়না বলে পরদিন দুর্বৃত্তেরা মহিলাকে ট্রামে চপেটাঘাত করল না? বিয়ের গয়না লুঠ করে বাপছেলেকে খুন করল কারা? কেবল "ধর্মেন্দরের" দোষ!

লেখকের এই সমাজ, এই-ই চিত্র। তিনি যা দেখবেন তাই লিখবেন। কোনো পরোয়া না করে। আমি তো লেখকদের এই দুর্মদ সাহসের প্রশংসাই করি। সাহসী "স্বাধীন" লেখকেরা সমাজকে ন্যাংটো করে দেখাচ্ছেন। এ রবি ঠাকুরের ব্রাহ্মপনা নয়, শরৎবাবুর শুচিবায়ুগ্রস্ততাও নয়।

আবার ব্যাজর-ব্যাজর করছেন! কী বলছেন? এই পচাগলা সমাজ-ব্যবস্থার ভেতরেও পরিবর্তনকামী নতুন শক্তির উৎসকে তুলে ধরার প্রয়োজন! "নতুন শক্তি"! তাই বলুন, আপনি সামাজিক বিপ্লবের পক্ষপাতী। এতক্ষণ কথাটা বললে তো অনেক সময় বাঁচত। সাহিত্যকে আপনি সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র করতে চান? দেখুন মশায় কলম ধরে বিপ্লব করতে গেলে কলমের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বিপ্লব করতে গেলে আপনাকে রাইফেলই ধরতে হবে। কলমের খোঁচায় একটা শত্রুরও বক্ষ বিদীর্ণ করা যাবে না।

আপনি তবু বলছেন? শাদা বাঙলায় বলুন। একটু ঝেড়ে কাশুন, মাইরি।

সমাজের বিপ্লবী শক্তি, সচেতন শ্রমজীবী চলমান মানুষ, কলেকারখানায়, গ্রামেগঞ্জে, যারা সংগ্রামে আত্মদান করে, মানুষের জড় চিন্তার জঞ্জালে আগুন জ্বালায়, যারা যারা...

বুঝেছি। আপনাকে শ্লোগানে পেয়েছে। আপনি সংগ্রামী সাহিত্যের খোয়াব দেখেন। কেন বলুন তো? বিপ্লব হলে আজকের সাহিত্যিকের বাড়তি মূল্য কী হবে? "স্বাধীনভাবে" মদ-মেয়েমানুষ বাড়ি-গাড়ি চালাতে পারবে? লেনিনের বিপ্লব করা দেশে শিল্পীর "স্বাধীনতার" কী নির্লজ্জ ধর্ষণ! সেদিন বৈচিত্র্যের জন্যে পরস্পরের বউকে পালটাপালটি করে যৌনসুখ করা পর্যন্ত চলবে না। নার্সিং হোম থেকে ফিরে গায়িকা পরস্ত্রীর বাড়িতে কিছুদিন নৈশসংগীত উপভোগ পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

বিপ্লবে সাহিত্যিকদের নগদ কোনো লাভ নেই। বরং প্রচণ্ড লোকশান।

বিপ্লবী শক্তি খুঁজতে চান, বরং আপনি খুঁজুন। ইচ্ছে হয় কলম ধরে 'জনগণের লেখক' হন; সে আপনার মর্জি। এঁদের বিবর, প্রজাপতি,

পাতক, ঘুণপোকা, অরণ্যের দিনরাত্রি, সহবাস, দংশন লিখতে দিন। মাদক বড়ি, বেলবটস্, ধর্ষণ চালিয়ে যেতে দিন।

আবার এক কথা! আপনাকে নিয়ে পারা গেল না মশায়। কত রাজনীতির ছেলে আজো ঘরে ফিরতে পারে না, কত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী খুন হয়, জেলে পিটিয়ে বিপ্লবী ছেলেদের হত্যা করা হয়, সোমবারের আগে কোর্টে হাজির করতে হবে না জেনে মেয়েদের শনিবারে থানায় আটক করা হয়, রেলওয়ে কর্মীদের ধর্মঘটে গুলি চালনা হয়...

হল তো কী হল? এগুলো তো সংবাদপত্রের ঘটনা, এগুলো নিয়ে সাহিত্য হবে? সাহিত্য কী রাজনীতি মশায়? এই রাজনীতি করে করেই তো মানিক বন্দ্যোর বারোটা বাজালেন। আহা, পুতুল নাচের ইতিকথা, আহা দিবারাত্রির কাব্য। তিনি কিনা লিখলেন চিহ্ন, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, হারানের নাত জামাই, মাসিপিসি, পেটব্যথা, ছোঃ।

আশংকা হচ্ছে ভদ্রলোক সম্ভবত এই লেখকদের হৃদয় পরিবর্তনের কথা ভাবছেন। সমাজহিতৈষণার চুলকুনি নিয়ে সোনাগাছি এলাকাতেই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন করবেন! (অশ্লীল উপমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী) ভদ্রলোকের যদি এমত শুভেচ্ছাই থাকে তাহলে তাঁকে উপদেশ দেবো: দাসেরা পৃথিবীতে কোনো কালে বিপ্লব করেনি, যেহেতু দাসত্ববোধই তাদের নেই। চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী থেকেও যে বাঘ নিজেকে পশুশ্রেষ্ঠ বলে পুলকিত হয়, তার প্রতি করুণা করতেই হবে। আসল কথা কী জানেন? বড়-লোকের দোকানে সেলসম্যানশিপ করতে করতে ভুলে যান যে এঁরা মালিক নন্, মালিকের চামচে মাত্র। চামচেগিরি করে বড়লোকের বদান্যতায় দু'চার পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য নয়, মালিক পক্ষের বউঝির দাঁড়ের ময়না হয়ে বই লেখা যায়।

কাজেই আপনাকে অন্য শিবিরে যেতে হবে। হ্যাঁ সংগ্রামী শিবিরের লেখকদের কাছে।

বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের কলমচী 'বামপন্থী সাহিত্যের ঐতিহ্য' খুঁজে পাননা। না-রচনাশৈলীতে, না-বিষয়ে। এবং বামপন্থী মহল নাকি ঢোক গিলে অপযশ স্বীকার করে নেন।

এও এক জাতীয় হীনমন্যতার ব্যাধি। সায়েবদের দেখলে যেমন এখনো আমাদের হয়। ইংরেজি-বলা কালা সায়েবদেরও।

'লেখক' শব্দটাই যথেষ্ট গোলমেলে। এক পক্ষ সদর্থে লেখক হলে অপর পক্ষ (বই লিখলেও) আর লেখক হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হলে সন্তোষ ঘোষ আর লেখক নন। আসলে লেখক সদর্থে এক ধরনেরই হয়। হয় মিছরি নয় মুড়ি!

হ্যাঁ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের গর্ব। একাই একশো। এঁর ধারে কাছে কে আসবে। মরণ আর কী? স্টাইল আর বিষয়ে এঁর পুতুল নাচের ইতিকথা কিংবা পদ্মানদীর মাঝির পায়ের কাছে কারা আসবেন? নবেন্দু ঘোষের ডাক দিয়ে যাই, ফিয়ার্স লেন-এর ধারে কাছে কোন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এগোবেন? নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অজস্র উজ্জ্বল গল্প ইতিহাস হয়ে রয়েছে আজো। সুশীল জানা, ননী ভৌমিক কিংবা একদা আদাব, কিমলিস-এর লেখক সমরেশ বসু? (পরবর্তী কালে সমরেশ নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বজন্মের লেখাগুলোকে তুলে নেন নি!)

আরে মশায় ধনী মুরুব্বি থাকলে লেখক বানানো যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী লেখক জন্মায়, বানানো যায় না।

কথাটা কী জানেন এই ধনী শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মুরুবিব ছাড়া দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে তাঁদের পক্ষে যাঁদের নিজস্ব যোগ্যতা কোনোদিন প্রমাণিত হবার সুযোগ পায়নি। সাজানো মূর্তি দেখে কোনো মাতাল স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিল কার্তিকের মাথায় জল ঢেলে দিন দেখবেন খড় বেরিয়ে পড়েছে।

এই 'সরীসৃপ' লেখক-বেরাদাররা কী নিজেদের অবস্থাটা জানেন না? ভালোই জানেন বলে বাবুমশায়ের সাহায্যে প্রকৃত লেখকদের দাবিয়ে রাখতে চান। প্রতিদিনই যদি তাদের লেখক বলে প্রচার করা যায়, (যেমন করে, ক্রমান্বয়ে মিথ্যা চেঁচিয়ে গেলে একদিন সেটা সত্য বলে ভ্রম হয়) তাহলে তাঁরাই একমাত্র লেখক হবেন। কোনোরকম প্রতিযোগিতার ঝুঁকি তারা নিতে চান না। কারণ প্রতিযোগিতা কেবল সমানে সমানে হয়। তাঁরা জানেন গুষ্টিশুদ্ধ তাঁদের যোগফল করলেও এক মানিক বন্দ্যো হয় না! এমনকি রমেশ সেনও নয়।

কথায়-কথায় অনেক দূরে চলে এসেছি।

দুঃখের বিষয় প্রাচীন জিজ্ঞাসু ভদ্রলোকের "লেখক শ্রদ্ধা" বিষয়ক প্রশ্নটার শেষ পর্যন্ত কোনো উত্তরও দেওয়া হল না।

নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী শান্তিরঞ্জন

একমাত্র মৃত্যুর খবরের মারফত বাঙালী পাঠক এই প্রথম জানলেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আনন্দবাজার পত্রিকার জনৈক সাব-এডিটর তিনি নাকি কিছু গল্প-উপন্যাস লিখে গেছেন! পাঠকদের পক্ষে একটি আবিষ্কার বটে!

আশ্চর্য, শান্তিরঞ্জন দীর্ঘকাল আনন্দবাজারে কাজ করেছেন, একই ছাদের তলায় "দেশ" নামক বিজ্ঞাপনের স্যুভেনির বেরোয়, সেখানেও কই শান্তিরঞ্জনের কোন রচনাও তো দেখা যায় নি! বিষয়টি ভীষণ গোলমেলে মনে হচ্ছে না কি? দেশ-এ বেরুল না, অথচ শান্তিরঞ্জন লেখক ছিলেন? আনন্দবাজারে চাকরি, বাঙলাদেশের "লেখক" মাত্রই তো বাজারের চাকুরে, কার নাম করব? অথচ শান্তিরঞ্জনের লেখা 'দেশ'স্থ হয় নি কোনদিন! যদিচ ওখানকার লেখকমাত্রই শান্তিরঞ্জনের বন্ধু!

কেন? কী হল ব্যাপারটা?

নাকি শান্তিরঞ্জন চাকরি করতেন সাংবাদিকতার, সাহিত্যের চাকরিগিরি করা অন্যদের মতো অন্যতম শর্ত মনে করতেন না? একটু মোসাহেবী, একটু ভাই-বেরাদার হয়ে-ওঠা না তাও তিনি পারেন নি।

অত্যন্ত রাগী মানুষ ছিলেন তিনি। মনে-প্রাণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য, সাহিত্য করতে চাকরগিরি করা ধাতে সয় নি।

সন্তোষ ঘোষ স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে তাঁর আপসহীনতার জন্যে লেখক জীবনের এই ট্রাজেডির কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ আমরা হুকুমে যদি কলমবাজী করতে পারি শান্তিরঞ্জন পারে নি। বড় বেশি আহাম্মুক ছিল শান্তি। বাবুমশায়ের টাউটগিরি করে বাড়ি-গাড়ি মায় মদের জোগানটা অনায়াসে হয়ে উঠতে পারত। লোকটা খালাশিটোলায় ধেনো মদ খেয়ে স্বাস্থ্যহানি করল!

সেই শান্তিরঞ্জন মারা গেলেন, প্রথম পাতায় ছবি ছাপা হল। সতীর্থরা (শান্তি মুখের সামনে আমাদের চোর বলত) চিতায় ফুল ছড়িয়ে দিয়ে দারুণ বোষ্টুমি কায়দায় তাঁকে পরপারে পাচার করল!

দেশ-এ কয়েক লাইন কবিতা বেরুল শান্তিরঞ্জনের। যে চাকরগিরির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ, কবিতা ছাপিয়ে ওর কর্মচারী-বেরাদাররা ওঁর আপসহীন ব্যক্তিত্বের স্পর্ধায় থুতু ছিটিয়ে দিল। শান্তিরঞ্জন বেঁচে থাকতে যা তারা করবার সাহস পায় নি। কে অধিকার দিল ওর কবিতা দেশে ছাপবার ?

শান্তিরঞ্জন স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এর আগে দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তাররা সাবধানে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। রাত্রে ঘুমের জন্য একটি মাত্র স্লিপিং পিল বরাদ্দ। মরবার জন্য বদ্ধ-পরিকর শান্তি চব্বিশটা পিল খেয়ে ফেলেছেন।

না, আর বাঁচানো যায় নি তাঁকে।

কিন্তু সংগ্রামী লোকের এই অপমৃত্যু কেন ?

সহকর্মীরা বলেন : ও বড় চীনপন্থী ছিল। মাও-সে-তুং-এর নির্ভুল নেতৃত্বে ওর প্রচণ্ড আস্থা ছিল। ও বিশ্বাস করত মহান চীনই একমাত্র আদর্শনিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দেশ। সোভিয়েত সংশোধনী নেতৃত্বে তাঁর সুতীব্র ঘৃণা ছিল।

সেই বিশ্বাসও তাঁর চূর্ণ হয়ে গেল যেদিন নাকি নিকসন চীন সফরে গেল! সেদিন শান্তিরঞ্জন ভীষণ আঘাত পেয়েছিল বলে সহকর্মীরা জানালেন।

এই ঘটনাই যদি শান্তিরঞ্জনের আত্মহত্যার কারণ হয়ে থাকে তাহলে বলার কিছু নেই। এবং ওর কর্মচারী বন্ধুরাও বুকের বোঝা হাল্কা করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন শান্তিরঞ্জনের মতো আরো অনেক লেখককে এইভাবে মরতে হবে। সুভাষ এটা আগেই বুঝেছেন বলেই আনন্দবাজারে স্বনামে বেনামে ফিচার রচনায় নেমেছেন। এই সেদিন তিনি কাগজের মালিককে খুশি করে 'ক্ষমা নেই' লিখেছেন পূর্ব বাঙলায় প্রতিহিংসার বিদ্বেষ জাগাবার গরজে। অথচ এই পশ্চিম বাঙলায় জেলে পিটিয়ে সেরা যুবকদের মেরে ফেলা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাম্যবাদী (?) সুভাষ, সন্তোষ ঘোষের সমগোত্রীয়।

হ্যাঁ শান্তিরঞ্জনের মতো অনেক লেখক এইভাবেই মারা যাবেন। যাঁরা নায়েবগিরি করতে পারবেন না, মূর্খ বাবুমশায়দের সভাসদ হতে পারবেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বয়কট করেছিল আনন্দবাজার।

মানিক মারা গেছেন। কলমের গোলামি করেন নি। তারাশংকরকেও শেষ পর্বে বয়কট করেছে আনন্দবাজার। তারাশংকরও গত হয়েছেন। এই বাজারের মুরুব্বির পশ্চাদ্দেশে লাথি মেরেছিল একদা অবধূত। বাবুমশায়রা ভেবেছিলেন সব লেখকই তু বললেই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ছুটে যাবে।

শান্তিরঞ্জন এক ক্ষুরে মাথা মুড়োলেই কল্‌কে পেয়ে যেতেন। বড় বেশি একরোখা, নিজের আখের গোছাতে জানতেন না। শান্তিরঞ্জন কোথায় লিখবেন, কী লিখবেন এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ফলে তাঁর রচনাদি সাগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে প্রগতিশীল সাময়িকপত্রে, অগণ্য লিটল ম্যাগাজিনে। বস্তুত শান্তিরঞ্জন লিটল ম্যাগাজিনেরই লেখক ছিলেন। যেমন করে মানিক শেষ জীবনে আপস না করবার সিদ্ধান্তে লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে বেছে নিয়েছিলেন।

বিশেষ করে বাঙলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে শান্তিরঞ্জনের আশ্চর্য বলিষ্ঠ গল্প-গ্রন্থগুলি কী আপনারা পড়ে দেখেছেন? রামরহিম? সুসমাচার? প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি? না, বিদেশী ছোট গল্পের চুরি নয়, অনুকরণ নয়। একেবারে গনগনে তাজা মৌলিক গল্প। শিড়দাঁড়া খাড়া করে গল্পগুলি পড়তে হবে। আনন্দবাজারীয় স্ত্রৈণ গল্পের ছাঁচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সাহিত্যে নপুংসক ন্যাকামির বিরুদ্ধে শান্তিরঞ্জন ঈর্ষণীয় পুরুষ। যেমন ঋজু ভাষা তেমনি বলিষ্ঠ বক্তব্য। মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো জ্বালাময়। শিল্পীর অহংকারী ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করবে এমন সাহস কার?

সস্তা নামের কাঙাল ছিলেন না শান্তিরঞ্জন। সাহিত্যে দাদাগিরি তাঁর অপছন্দ। কাগজে নাম ছাপার লোভে না করলেন সভাপতিগিরি, না পৌরোহিত্য। বিবৃতি ছাপবার লালসায় পর্যন্ত মুক্তকচ্ছ হয়ে ধেয়ে এলেন না।

আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর ব্যক্তিত্বে এনেছিল স্বাতন্ত্র্য। চাকর-বনে-যাওয়া সাহিত্য-সংসারে চাকর-না-হতে-পারাটাই তাঁর আশ্চর্য বাহাদুরি।

শান্তিরঞ্জন মনেপ্রাণে একজন শিল্পী ছিলেন। সাধারণত আশেপাশে "লেখক"-নামে যে ধরনের ছোটো মনোবৃত্তির জানোয়ার ঘুরে বেড়ায়, তিনি সেই সকল জীবদের উর্ধ্বে প্রকৃত উদার হৃদয়বান মানুষ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন লেখক হতে গেলে নোংরা জীব হওয়া চলেনা, যেহেতু সাহিত্যকর্ম একজন সামাজিক বিবেকসম্পন্ন মানুষের পবিত্র কাজ।

নোংরামির যুগে এধরনের মুষ্টিমেয় পরিচ্ছন্ন মানুষ আমাদের অনেক সান্ত্বনা এবং উৎসাহের উৎস।

মার্কসবাদী সাহিত্যের পক্ষে

কিছুকাল আগে সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় জনৈক সনাতন পাঠক গায়ের ঝাল মিটিয়ে বামপন্থী সাহিত্যের ঐতিহ্যকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি এমন দাবিও করেছেন, শিল্পগুণের প্রশ্নে বামপন্থী রচনা একেবারে ব্যর্থ।

বড়লোক মুরুব্বির জোরে হালে এই পত্রিকার লেখকেরা এমন ভাব দেখাচ্ছেন, এমন কথা বলছেন, যাতে সন্দেহ হয় পৈতৃক সূত্রে তাঁরা সাহিত্যের সম্পূর্ণ খবরদারির অধিকার অর্জন করেছেন। তাঁরা যথেষ্ট বই লিখেছেন, বুর্জোআ বাজারে খ্যাতিও কুড়িয়েছেন, কেউ এ ব্যাপারে তাঁদের চ্যালেঞ্জ করতে যায় নি। এবং যতদূর মনে হয় বামপন্থী মহলও সাহিত্য-ব্যাপারে অপর পক্ষের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো লিখিত প্রশ্ন রাখে নি। এ কথা একটা শিশুও জানে বুর্জোআ বাজারে তাঁদের রচনাই বহুল প্রচারিত হবে। নিয়মের স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করবে কোন মূর্খ!

অথচ এই শিশুবোধ্য স্বাভাবিক ব্যাপারটা নিয়ে শ্রীমান সনাতনের গৌরববোধ করার মধ্যে কেমন সংশয় জাগে, যেন এই গৌরবটুকু তাঁদের নিজস্ব উপার্জন নয় বলে নিজেরই বোধ হয় কিছু হীনমন্যতা রয়েছে। যেমন ক্রাচে ভর দিয়ে পঙ্গু লোক দাঁড়াবার চেষ্টা করে। যদিচ পঙ্গুত্বকে চলিষ্ণু করতে গেলে ক্রাচের ভর তো নিতেই হবে। এতে লজ্জার কিছু নেই।

এই ধনী শাসিত সমাজ বিন্যাসে যে কোনো ক্ষেত্রে দাঁড়াতে হলে মুরুব্বির সাহায্য ছাড়া পথ কোথায়! তা নাহলে এতদিন সনাতন পাঠককে 'কৃত্তিবাস' কালেভদ্রে বের করেই অবহেলিত জীবন কাটাতে হত, বড় জোর তিনি লিটল ম্যাগাজিনের পরিচালক হতেন। 'আত্ম-প্রকাশ'-এর জন্যে তাঁকে দেশত্ব হতেই হবে। এবং একবার আত্মপ্রকাশিত হলেই লাইন মাফিক 'প্রতিদ্বন্দ্বী' 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র সত্যজিৎ কৃত চলচ্চিত্রায়ণও অনায়াসে হয়ে যায়। এবং মুরুব্বি মালিকের ইচ্ছায় সনাতন পাঠকের ছদ্ম আংরাখায় সাময়নও দেওয়া যায়।

যেমন সম্প্রতি দিয়েছেন বামপন্থী সাহিত্যের বেলায়। এবং একপ্রা

স্বীকার করাই ভালো। বামপন্থী সাহিত্য সম্পর্কে শ্রীমানের এবম্বিধ মন্তব্য মালিকেরই স্বার্থবাহী। অর্থাৎ ওই পত্রিকার সামগ্রিক ধ্যান-ধারণারই নির্যাস। সনাতন পাঠক তার চাকরির শর্ত জানেন। বুর্জোআরা তো এইভাবেই কিছু মধ্যবিত্তের সাহায্যেই রাজত্ব চালান। যখন যে রাজা থাকে এঁরা তাঁরই সভাসদদের আসনটি দখল করেন।

আমার যতদূর বিশ্বাস, সনাতন পাঠকের এই নিরাপদ সৌভাগ্যে বামপন্থী মহল ঈর্ষা করবেন না। কারণ সৌভাগ্য সম্পর্কে ধারণা সব মহলের একরকম নয়। শ্রীমান সনাতন নিজস্ব ধ্যানধারণা অনুযায়ী শিবির বেছে নিয়েছেন। তাঁর পক্ষে অন্যরকম হওয়া সম্ভব ছিল না। এমন কি তিনি কলেজ জীবনে ফেডারেশন করেছেন, এ জাতীয় প্রচুর ফর্মুলাতেও কিছু যায় আসে না।

এখন কথা হচ্ছে, শ্রীমান ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার ছত্রছায়ায় বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন, কেউ তাঁর স্থান থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন না। আমরা কামনা করি তাঁর আরো শ্রীবৃদ্ধি হোক। তাহলে তিনি খামোখা বামপন্থী সম্পর্কে এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে গেলেন কেন! পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁর বিনা খরচায় সার্টিফিকেট দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? ওই রচনার পরিবর্তে নিক্সোডার্মের বিজ্ঞাপন ছাপলে তো মালিকের কিছু অর্থাগম হত! আবার শ্রীমান্ উষ্মা প্রকাশ করেছেন: তাঁদের নাকি চাকরি তুলে গালা-গালি করা হয়। খুবই অন্যায় বইকি! কেউ কেউ যদি মালিকের গাড়ি ধোয়াটাও চাকরির অঙ্গ মনে করেন তাতে অন্যের কী বলবার আছে!

প্রথম ধাক্কাতেই শ্রীমান সনাতন নামকরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করেছেন। কথাটা কী? না, 'বামপন্থী সাহিত্য'। কথাটা যদি 'বামাপন্থী সাহিত্যের' বিকল্প হিসাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে তাহলে তর্কের কিছু নেই। যদিচ মনে হয় সনাতন পাঠক ঠিক এই উদ্দেশ্যে কথাটা ব্যবহার করেন নি। বৃহত্তর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-লড়ায়ের পক্ষে সাহিত্যকে যদি তিনি বামপন্থী বলে থাকেন তাহলে চিন্তা জাগছে এই সাহিত্যের ধারা কোথা থেকে শুরু করা যায়? মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ', অথবা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'? বোধ করি শ্রীমান্ সনাতন দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে এতদূর স্বাধীনতা দিতে চাইবেন না।

তাহলে মোটা কথায় আসা যাক। 'বামপন্থী সাহিত্য' বলতে বস্তুতই

তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী সাহিত্যের ধারাকেই সূচিত করছেন। এবং আমাদের অনুমান যথার্থ হলে তিনি রাজনীতির মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর মার্কসবাদ-বিরোধী মতবাদকেই তুলে ধরেছেন।

আমরা একথা সবিনয়ে স্বীকার করি, মার্কসবাদের বিরোধিতা না থাকলে মার্কসবাদই মিথ্যা প্রমাণিত হত। এমন কি মার্কসবাদের তকমা এঁটে মার্কসবাদের বিরোধিতার ইতিহাসও একই সত্য প্রমাণিত করে।

সনাতন পাঠক পছন্দ করুন আর নাই করুন, মার্কসবাদ আজ পর্যন্ত বস্তুবাদী প্রগতিশীল দর্শন এবং প্রয়োগ নৈপুণ্যে প্রমাণিত সত্য। এই বিশ্ব-বীক্ষাকে অবলম্বন করে এদেশের কিছু সচেতন মানুষ যদি রাজনীতি তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পথে এগোবার চেষ্টা করেন তাতে কায়েমী স্বার্থের শিবিরের সেবাদাস সনাতন পাঠকের অরুচি হওয়ারই কথা। কিন্তু আপত্তি এক জিনিস বাস্তব অবস্থা ভিন্নতর ব্যাপার। তিনি চান বা না চান সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম রয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে আজ বা কাল অনিবার্য ভাবে দুটো যুধ্যমান শিবির স্পষ্ট মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। দুই শিবির, দুই রাজনীতি, দুই সংস্কৃতি। সনাতন পাঠকরা বুর্জোআ শিবিরের ভাড়াটে দ্বারপাল। সামন্ত-তন্ত্রের চিতাভস্মের ওপর একটা বুর্জোআ প্রগতিশীল সমাজের জন্ম হয়েছিল এটা যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি এটিও ঐতিহাসিক পরিণতি যে বুর্জোআ সামাজিক ধ্যানধারণা আজ দেউলে এবং স্পষ্টত প্রতিক্রিয়াশীল। সনাতনবাবুদের কাজ এই পচনধরা দশাটার গালে রংচং মাখিয়ে চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে রাখা। তারই জন্যে চাই মাদক বড়ি, ধর্ষণ, যৌন বৈচিত্র্য, রাজনীতির চোলাই, ধর্মের বুজরুকি। বেকার ছেলে বেশ্যাবাড়ি যায়, মদ খায়, প্রেম-প্রেম খেলে, পয়সা কোথায় পান ঈশ্বর জানেন! এই সকল বিষয় চর্চার সুবিধে এই যে, চট করে পাঠককে আক্রমণ করে চিৎপাত করা যায়, তার বাহ্যিক কাণ্ডজ্ঞানকে ঝিমিয়ে রাখা যায়। সমাজ জীবনে অমানুষিক দারিদ্র্য, বেকারী, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারের মতো ব্যাপারগুলিকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। এবং দিনের পর দিন একেই 'জীবন যে রকম' বলে পোষমানা বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে দুশ্চিন্তার দায় থাকে না! এবং এ জাতীয় কার্যাবলীর সঙ্গে যদি দিনে একবারও বামপন্থী সাহিত্যের মুণ্ডুপাত করা যায় তাহলেই কেল্লা ফতে। কারণ লোকে সনাতন পাঠকের কথাই শুনবে যেহেতু তিনি সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিকের লেখক এবং

বাজারে তাঁর বই কাটে। অর্থাৎ সনাতন আগে প্রমাণ করেছেন তিনি লেখক তারপর লেখকের অধিকার নিয়ে বামপন্থী সাহিত্যের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছেন। এটা অধিকারীর মন্তব্য।

চিৎকার যখন উঠেছেই তখন চুপ করে থাকাটা কাপুরুষতা। চিৎকৃত ব্যক্তিটির বিষয়গত যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নও তোলা থাক।

মার্কসবাদী চৈতন্যে অভিষিক্ত এমন একজন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং প্রধান পুরুষ। আমাদের গর্ব। এ গর্ব সংগ্রামী মানুষেরই। মানিক ব্যক্তিত্বে একাই একশো। সনাতন পাঠক কী মানিকের শিল্পগুণান্বিত সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার স্পর্ধা রাখেন? মার্কসবাদী হওয়ার আগে বা পরে তাঁর তামাম সাহিত্যের সঙ্গে সনাতন বা তাঁর ভাই-বেরাদররা কে প্রতি-যোগিতায় নামবেন? হ্যাঁ লিখুন একটা পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, চিহ্ন, সোনার চেয়ে দামী, প্রাগৈতিহাসিক, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, হারানের নাতজামাই, মাসিপিসি, পেটব্যথা শীর্ষক উজ্জ্বল গল্প? মানিক বাবুর ওভারকোটে সনাতন সমেত গুষ্টিশুদ্ধ লেখকেরা গায়েব হয়ে যেতে পারেন নিঃশব্দে। ভাষা-নির্মাণ, বিষয়, আঙ্গিক-কুশলতার প্রশ্নে কী সনাতন মুখ খুলতে সাহসী হবেন? মানিক মার্কসবাদী হওয়ার জন্যে সনাতন পাঠকরা বড়ই ক্ষোভ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান আজকের দুনিয়ায় মার্কসীয় দর্শন আয়ত্ত ব্যতিরেকে কেউই প্রধান সাহিত্যিক হতে পারেন না। মার্কসবাদী সাহিত্য সর্বদা জনগণের পক্ষে, জনবিরোধী নয়। শোষণমুক্ত সুস্থ জীবনযাত্রার লক্ষ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, পরিচালিত করাই এর পবিত্র কর্তব্য। এ শাশ্বত সত্য, শাশ্বত সমাজবিধান, নিরালম্ব মানবিকতার পাত্রে শ্রেণী সমন্বয়ের ভাঁওতা প্রচার করে না। সমস্ত অঙ্গকে ছাঁটাই করে, যৌনাঙ্গের প্রদর্শনী করে না। কেরিয়ারের প্রলোভনে আত্মমর্যাদা, বিবেককে বন্ধক দেয় না। এ সাহিত্য সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-নয়া উপনিবেশবাদের বিরোধী। এবার কী প্রশ্ন করা অভদ্রতা হবে সনাতন পাঠকরা কী সত্যই জীবন যে রকম সে রকম দেখছেন? দারিদ্র্য, বেকারী, হতাশা, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণে কী প্রতিক্রিয়া তাঁদের সাহিত্যে? অন্তের দুয়ারে দৃষ্টি বাঁধা রেখে বড়লোকের মোসাহেবী রচনা তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বাঙলাদেশেই কোনো যুগে লেখকদের মধ্যে এমন 'ক্রীতদাস সাহিত্য' সৃষ্টি করবার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা এর আগে দেখা যায় নি। সাহিত্য যে

বাইজির 'মুজরো' পাবার ধান্দাবাজী নয় সেকথা তাঁরাও অবশ্যই জানেন। যেহেতু এযুগে 'ভালোমানুষ অবুঝ' সাজবার তেমন অবকাশ নেই।

ইতিহাসে বুর্জোআ পর্বের একটি লম্বা অধ্যায় রয়েছে। বৃদ্ধ জরদ্‌গব এই সমাজের শিল্প সাহিত্যের পরিমাণও প্রচুর। সনাতন পাঠকেরা এই পর্বেরই সূত্রবাহক। তাঁরা ঐতিহ্য মাফিক দাগা বুলিয়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু মার্কসবাদী ভাবধারা সমাজ পরিবর্তনের যজ্ঞে নতুন সব কিছু সৃষ্টি করতে চান। এমন কি তাঁদের সাংস্কৃতিক ভাবমণ্ডলকে পর্যন্ত। ফলত পুরনো কায়দায় নয়, কী-রচনাশৈলী কী-বিষয় মাহাত্ম্যে তাঁদের প্রচলিত ধারাকে বর্জন করে, নতুন সড়কে এগোতে হবে। পায়ের চলার বেগেই তার রাস্তা জাগবে, ছন্দ জাগবে। নিশ্চয়ই এই অভিযান প্রথাসিদ্ধ নয়। মার্কসবাদী সাহিত্য মানেই 'নতুন সাহিত্য'। কাজেই শ্রীমান সনাতন তাঁর পুরনো গজ-ফিতে দিয়ে একে মাপবার চেষ্টা করে পণ্ডশ্রম করবেন। তেভাগার সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত 'হারানের নাতজামাই' গল্পের সঙ্গে কী-বিষয়ে কী-শৈলীতে সনাতন একাত্মবোধ করতে পারেন না। তাঁর সাহিত্যের ভঙ্গি ও বিষয়ের সঙ্গে তুলনায় এই গল্পকে 'প্রোপাগাণ্ডা' বলে নস্যাৎ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। শ্রীমান সনাতনের ভাববাদী বুর্জোআ দর্শনের চশমায় এ গল্পকে শিল্পসম্মত ছাড়পত্র দেওয়া কষ্টকর। 'শিল্প' বলতে সনাতন পাঠক বোঝেন এমন একটি বস্তু যা স্বেদ-রক্ত-সংগ্রামের বিপরীত। সাহিত্য ছাড়া সাহিত্যের দ্বিতীয় কাজ নেই। অর্থাৎ মুরুব্বি পেলে বই লেখা, ছাপানো, বিক্রি করা এবং সিনেমাস্থ হওয়া।

মার্কসবাদী সাহিত্যকে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিবর্তনকামী ও পরিবর্তনবিমুখ পরস্পর শ্রেণীস্বার্থকে সঠিক চিহ্নিত করেন এবং তাঁর রচনায় বিপ্লবের নান্দীমুখ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সর্বোপরি মার্কসবাদী লেখক আরো দশজন সৎ শ্রমজীবীর সঙ্গে নিজেকেও কলমের মজুর হিসেবে স্বীকার করেন। বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থেই তাঁর শ্রম নিযুক্ত হয়। তিনি বুর্জোআ লেখকদের মতো কেরিয়ার তৈরি করে জনগণের ঊর্ধ্বে বিশেষ সুবিধা দাবী করেন না। যেহেতু তিনি জানেন দারিদ্র্য-কবলিত হাজার হাজার মানুষের এ সমাজে লেখক এক অতন্দ্র বিবেক। বুর্জোআরা যেমন মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারপাল মাত্র, মার্কস-বাদী লেখক তেমনি 'জনগণের গুপ্তচর'। পাইকারি অশিক্ষা এবং লেখকদের

জনগণের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নি বলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীজাত মার্কসবাদী লেখকগণ স্বশ্রেণী স্বার্থত্যাগ করে ক্রমশ যে বৃহত্তর জনজীবনের শরিক হবার চেষ্টায় রয়েছেন, এই সদিচ্ছাকে লঘু করে দেখার অর্থ নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ছেড়ে দিলাম। শ্রীমান সনাতন কী অধুনা প্রায় বিস্মৃত রমেশচন্দ্র সেনের নাম শুনেছেন? তাঁর কুরপালা, কাজল, শতাব্দী বইগুলি পড়া আছে? পড়া আছে ডোমের চিতা, তারা তিনজন, শাদা ঘোড়া শীর্ষক অনবদ্য গল্পগুলি? একবার পড়ে দেখলে শ্রীমান সনাতন তাঁর দাম্ভিকতায় লজ্জা পেতেন।

এমন কি একদা মার্কসবাদী সমরেশ বসুর গল্পগুলি? আশা করা যায় সমরেশ তাঁর পূর্বজন্মের লেখাগুলি আজো অস্বীকার করেন নি!

মার্কসবাদী চেতনায় ভাস্বর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলি কী নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে শ্রীমান সনাতনকে! কিংবা নবেন্দু ঘোষের ডাক দিয়ে যাই, ফিয়ার্স লেন এবং অসংখ্য গল্পগুলির কথা? অথবা কৃষক জীবনের সংগ্রামের পটে বিধৃত সুশীল জানার গল্পগুলি? ননী ভৌমিকের 'ধানকানা' কী সোমেন চন্দের 'ইঁদুর' গল্প কী তিনি পড়েছেন? অথবা শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ গল্পগুলি? অরণি, পরিচয়, অগ্রণী, চতুষ্কোণ, নতুন সাহিত্য-এর পুরনো ফাইলগুলি কী তিনি একবার অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন?

আশীষ বর্মণ, গুণময় মান্না, মিহির সেন, ঋত্বিক ঘটক, বিজন ভট্টাচার্য, সলিল চৌধুরী, সত্য গুপ্ত, শান্তি রায়, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, সুলেখা সান্যাল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সোমনাথ লাহিড়ী, অমল দাশগুপ্ত থেকে হালের চিত্ত ঘোষাল, তপোবিজয় ঘোষ, মণি মুখোপাধ্যায়, শংকর বসু, স্বর্ণ মিত্রের রচনার সঙ্গে কষ্ট করে একটু পরিচিত হোন না সনাতন পাঠক। বামপন্থী (?) সাহিত্য কি পরিমাণ শিল্পসম্মত একবার যাচাই করুন।

দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে আরেকবার শ্রীমান সনাতন তাঁর শিবিরের হালের লেখকদের দৃষ্টান্তসহ একটা পরিচয় দিন, যাতে তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে!

সাহিত্যে মার্কসবাদী চেতনা ও 'মহেশ'

শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পে সচেতনভাবে মার্কসবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে আমার এই মন্তব্য দুর্ভাগ্যবশত মার্কসবাদী-সমাজে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। অধিকন্তু কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি কোথাও কোথাও এমন কটাক্ষ করেছেন যে, কতিপয় মতলববাজ শরৎচন্দ্রকে মার্কসবাদী প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এমত কটাক্ষের অন্যতম লক্ষ্য যে আমিও সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি আমার কোন প্রবন্ধেই শরৎচন্দ্রকে মার্কসবাদী প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত হইনি।

"মহেশ" গল্পটি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত যে ভুল, এমন স্পষ্ট অভিযোগও কোথাও শোনা যায় নি। এর অর্থ এই হতে পারে তাঁর ও আমার মার্কসবাদী বিশ্লেষণে ঐকমত্ত নেই।

আমার বিশ্লেষণটিকে সূত্রাকারে বলতে গেলে

(এক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাহিনীতেও লেখক ব্যক্তিকে এমন করে চিত্রিত করেন যার ফলে ব্যক্তি তার শ্রেণীচরিত্রের স্বরূপে উপস্থিত হয়।

(দুই) গল্পের পরিণতিতে চরিত্রটিকে লেখক এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত করেন যা ভবিষ্যতের ইতিহাস-চেতনাকে লক্ষ্যবিদ্ধ করে।

"মহেশ" গল্পে গফুর দরিদ্র, শোষিত কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি। এবং কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমান চরিত্রকে বেছে নিয়ে লেখক কী এই সত্যটিকেও আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে বাঙলা দেশে মুসলমান-কৃষকই সংখ্যাগুরু? আপাত-নিরীহ, বশ্য, গফুরের জমিদারদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের প্রকাশ সেটিও কী বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত সাধারণ চাষীদের চরিত্রানুযায়ী নয়? যে-মানুষ ঘা খেয়ে পবিত্র মেজাজ দেখিয়ে জমিদারকে উপেক্ষা করবার মারাত্মক চেহারা দেখায় অথচ হাঁটু গেড়ে বসলে প্রভুর মার্জনা পাওয়ারও অসুবিধে হয় না! গফুর গ্রামত্যাগ করবার আগে নিষ্ঠুর সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে ধিক্কার দেয়।

আমার প্রবীণ বন্ধু রবীন্দ্রনাথের "সমস্যাপূরণ" গল্পের অছিমুদ্দির মতো আশা করেছিলেন গফুর কাস্তে দিয়ে জমিদারের গলা কাটতে যাবে,

যা জমিদারের "জারজ সন্তান" "সম্পন্ন কৃষক" অছিমুদ্দি করতে উদ্যত হয়েছিল! কাস্তে হতে তাড়া না করলেও গল্প যে কী-পরিমাণ শক্তিশালী হতে পারে "মহেশ" গল্পই তার দৃষ্টান্ত। আমাদের অতীব দুর্ভাগ্য বন্ধুবর "মহেশ" গল্পটিকে শক্তিশালী সমাজ-সচেতন গল্প হিসেবে ধরতেই চান না! এমত তাঁর মার্কসবাদী চৈতন্য!

গ্রাম থেকে উৎখাত তাঁর গফুর চরিত্রকে শরৎচন্দ্র কোথায় নিয়ে গেলেন? তাঁকে টেনে আনলেন চটকলে মজুর হিসেবে, যে মজুরশ্রেণী পরবর্তীকালে তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করবে। মূলত উৎখাত কৃষক আমাদের দেশের মজুরশ্রেণী কী সেইভাবেই গড়ে ওঠে নি? সেইকালে হাওড়া-হুগলীতে গঙ্গার তীরে তীরে গড়ে ওঠা চট-কলগুলি সম্পর্কে লেখক বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন অবশ্যই।

এইসব পটভূমিকায় "মহেশ" গল্পকে মার্কসবাদী চেতনাসম্পন্ন গল্প কেন বলা যাবে না আমার মাথায় তা আসে না।

এবার গল্পটি প্রকাশকালীন ঘটনাটি বিচার করে দেখা যেতে পারে।

হুগলী গভর্নমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বন্ধু অক্ষয়কুমার সরকার। বর্ধমান বিভাগের তৎকালীন কমিশনার সরকারী মতপ্রচারের জন্যে "পল্লীশ্রী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করেন। সম্পাদক নির্বাচিত হন অক্ষয়কুমার সরকার। পল্লীচিত্র নিয়ে একটি গল্প লেখার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র "মহেশ" গল্পটি লেখেন। গল্পটি তেরোশ উনত্রিশ সালের আশ্বিন সংখ্যায় "পল্লীশ্রীতে" প্রকাশিত হয়। অধিকন্তু গল্পটির বহুল প্রচারের জন্যে অক্ষয়বাবু গল্পটি কপি করে দিলে একই সময়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলেদের পত্রিকা "বঙ্গবাণীতেও" প্রকাশিত হল।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বঙ্গবাণীতে শরৎচন্দ্রের "অভাগীর স্বর্গ" তেরোশ উনত্রিশ, মাঘ, এবং "পথের দাবী"-ও তেরোশ উনত্রিশ, ফাল্গুন, ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গল্পটি কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল?

"মুসলীম সাহিত্য সমাজ" রচনাটি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

"মহেশ নামে আমার লেখা একটা ছোটগল্প আছে, সেটি সাহিত্যপ্রিয় বহু লোকেরই প্রশংসা পেয়েছিল। একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি ম্যাট্রিক-এর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে, আবার একদিন কানে এলো সেটা নাকি স্থানভ্রষ্ট

হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোন যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়তো নিয়ম। কিছুদিন থাকে আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গো-হত্যা আছে। আহা! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বহু টাকা আসনের কর্তা মশায় এ অনাচার সইবেন কি করে? তাই মহেশের স্থানে শুভাগমন করে-ছেন তাঁর স্বরচিত গল্প "প্রেমের ঠাকুর"।

"......আমার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে (প্রেমের ঠাকুরের লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র—বর্তমান লেখক) সসম্মানে নিবেদন করে রাখি যে খুব বড় হলেও মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় থাকা ভালো। ভাবা উচিত, তাঁর রচিত গল্পের সঙ্গে বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় না ঘটলেও বিশেষ কোন লোকসান ছিল না। টেক্সট বুক থেকে পয়সা পাইনে—ও ব্যবসা আমার নয়—সুতরাং ক্ষতিবৃদ্ধিও নেই—তবু ক্লেশ বোধ হয়! নিজের জন্য নয়—অন্য কারণে! শুধু সান্ত্বনা এই যে অযোগ্যের হাতে পড়লে এমনি দশাই ঘটে। যে ব্যক্তি কোনদিন সাহিত্য সাধনা করে নি সে কি করে বুঝবে কার মানে কি? শুনেছি নাকি আমার রামের সুমতি গল্পের খানিকটা দিয়েছেন। অত্যন্ত দয়া,—বোধ করি আশা এর থেকে রামেদের সুমতি হবে। কিন্তু মুশকিল এই যে দেশে রহিমরাও আছে।

"আর শুধু বিদ্যালয়ই নয়, মহেশের ভাগ্যে অন্য দুর্ঘটনাও ঘটছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাইনে, কিন্তু নিঃসংশয়ে জানি এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ ধরণের গল্প যেন আর না ছাপা হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্বনাশ হয়।"

প্রসঙ্গত বলা যায় "মহেশ" গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণীর এক অংশও ক্ষুব্ধ হন। মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকায় এর কড়া সমালোচনা বেরিয়েছিল।

"মহেশ" সম্পর্কে আমাদের এই তথ্যগুলি বিবেচনা করার দরকার রয়েছে। বেশিরভাগ পাঠক তথা সমালোচকবর্গ এই সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে গল্পটির যুগান্তকারী মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ। এই গল্পে ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটি ধরতে না পেরে ইদানীংকালের অন্যতম শরৎ

গবেষক গোপালচন্দ্র রায়ও "মহেশ" গল্পে পশুপ্রীতি ছাড়া কিছু দেখতে পান না। শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক পশুপ্রীতির সঙ্গে তিনি এমনি সরলীকরণ করেছেন। অথচ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "আদরিণীর" মতো "মহেশ" নিছক পশুপ্রীতির উদাহরণ নয়। এমনকি শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট থাকাটাও গল্পের ক্ষেত্রে বিচার্য নয়।

দৃঢ়তার সঙ্গেই সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, উৎখাত চাষীর শ্রমিক সত্তায় উত্তরণের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র সচেতনতায় সঙ্গে ভবিষ্যত ইতিহাসের দলিল তুলে ধরেছেন।

"মহেশ" লেখকের প্রক্ষিপ্ত সৃষ্টি নয়। কিংবা বৈচিত্র্যের লোভে তিনি এমন গল্প লিখেছেন তাও মনে করা সমীচীন হবে না। কারণ শরৎচন্দ্রের জীবন ও রচনাদর্শকে যারা সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন তাঁরাই এ সত্যকে স্বীকার করবেন।

সমাজজিজ্ঞাসা তথা রাজনীতিসচেতনতা শরৎ সাহিত্যের মূল প্রেরণা। লেখক তাঁর যুগের মূল দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে লক্ষ্যবিদ্ধ করেছিলেন। তাই সাম্রাজ্যবাদ তথা সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। "পথের দাবী" কিংবা "স্বদেশ ও সাহিত্যের" প্রবন্ধাবলী তার প্রমাণ। পরাধীন দেশের একজন সৎ সাহিত্যকর্মী হিসেবে তার সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সংগ্রামী মানুষের কাছে অফুরন্ত উৎসাহের কারণ।

জাতীয় সংকটের দিনে সাহিত্যচর্চা অপেক্ষা সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করা তাঁর কাছে অভিপ্রেত ছিল। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন পরাধীন দেশে সত্যকার 'স্বাধীন" রচনা লেখা সম্ভব নয়. তারি জন্যে দরকার বিদেশী শাসনমুক্ত অনুকূল পরিবেশ।

এমন ধারণা যে সাহিত্যিকের তাঁর কাছে স্বাধীনতার লড়াই-ই বড় হয়ে উঠবে বইকি।

তাই লেখকের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ্যসংস্কার লাঞ্ছিত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-অধ্যুষিত পল্লিসমাজ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

অত্যুৎসাহী পণ্ডিত এলোপাথাড়ি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জমিদার চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি অন্বেষণ না করে মুক্তচক্ষে দেখতে পারতেন "প্রেমিক" জমিদারের চাষী–শোষণে রঞ্জিত হাতটিকে তিনি কখনো লুকোন নি। সেই বিশেষ চরিত্রটিকে তিনি আড়াল করার চেষ্টা করলে অভিযোগ

সত্য মনে হত যে জমিদারী-ব্যবস্থার প্রতি শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথের মতোই দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য কখনোই জমিদারি প্রথার অন্যায়কে সমর্থন করে নি। জীবানন্দ নয়, রমা নয়, বিজয়াও নয়। "পথের দাবী" "জাগরণ", "স্বদেশ ও সাহিত্যের" প্রবন্ধগুচ্ছে তার প্রমাণ আছে।

বিষয়টা ভেবে দেখা চলে যে সামতাবেড়েতে বাড়ি তৈরি করে বাস করলেও শরৎচন্দ্র, যা তিনি ইচ্ছে করলেও পারতেন, কোনোদিন জমিদারি খরিদ করার স্বপ্ন দ্যাখেন নি।

অবাধ সাহিত্য-সাধনার জন্যেই রাজনীতি লেখকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আরো দশজনের মতো কেরিয়ার তৈরির যন্ত্র ছিল না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সহিংস-অহিংস কোনো পন্থার প্রতিই তাঁর অরুচি ছিল না। এমনকি ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন এবং পরবর্তী ধাপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথাও তিনি ভেবেছিলেন নিঃসন্দেহে। সোস্যালিস্ট নিউক্লিয়াস তৈরির প্রেরণা সৃষ্টিই শুধু নয়, "জাগরণ" উপন্যাসে বলশেভিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে রবীন্দ্রনাথ শ্রেণী-স্বার্থের কারণেই "বলশেভিক গুণ্ডাতন্ত্রের" নিন্দা করেন।

আলোচনা এত বিস্তারিত করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে যাওয়া, শরৎ-সাহিত্যে "মহেশের" মতো গল্প সৃষ্টি করাটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যচেতনার সঙ্গেই সুগ্রথিত। অর্থাৎ যিনি অরক্ষণীয়া পল্লী-সমাজ, বামুনের মেয়ে লেখেন; মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, পথের দাবীও সেই মানুষই লেখেন। শরৎ-সাহিত্য ধর্মে এটিই স্বাভাবিক। এমনকি "পরিণীতা"র মতো সেন্টিমেন্টাল প্রণয়নকাহিনী লিখতে গিয়েও তিনি নায়কের বাবার মহাজনী শোষণের চিত্রটি আঁকতে ভুলেন নি। গবেষকরা এই সত্যটিকে এড়িয়ে গিয়ে নিজের বিচার-বুদ্ধিকেই অপমান করেছেন বলে আমার দৃঢ় ধারণা।

পরিশেষে বিষয়টির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। যেখানে শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করেছেন রাশিয়ান সাহিত্যের মতো আমাদের সাহিত্য যতদিন না নীচুতলার মানুষের মধ্যে নেমে আসতে পারছে ততদিন আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যত নেই। "গোর্কির লেখা পড়লে আমার মাথা নুয়ে আসে"— এবম্বিধ উক্তিটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সম্পর্ক

অগ্রজ সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের আত্মীয়-তার সম্পর্কের কথা চিন্তা করেও কেবলমাত্র আমার বৃহত্তর পাঠকের মুখ চেয়ে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটি পরিষ্কার করবার প্রয়োজন বোধ করছি। আমার নাম না করেও নারায়ণবাবু তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত "কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে রবীন্দ্র-শরৎ সম্পর্কের আলোচনায় ইঙ্গিত করেছেন যে, দর্পণে কিছুকাল আগে ধারাবাহিক শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত আমার রচনায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে ঈর্ষা করতেন এ জাতীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। আমি পুনর্বার আমার উক্ত রচনাটি তন্ন তন্ন করে পড়লাম। ঈর্ষাজনিত ব্যাপারটা আমার নিজস্ব কোনো মন্তব্যে চোখে পড়ে নি। আমি কেবল রবীন্দ্রনাথেরই দুটো উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম।

প্রথম নম্বর, শরৎচন্দ্রের ৬১-তম জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অভি-ভাষণের অংশ "অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।"

দ্বিতীয় নম্বর, "আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারই আবিষ্কার।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণাংশ উদ্ধৃত করে দেওয়ার মধ্যে নারায়ণবাবু যদি ওই "ঈর্ষাজনক" ঘটনাটির গন্ধ পেয়ে থাকেন তাহলে আমি নিরুপায়। কিন্তু নারায়ণবাবু তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কোনো ঈর্ষা ছিল না অকারণ প্রমাণ করার প্রয়াসে যে যুক্তিগুলি দেখিয়েছেন তাতে আমার পক্ষে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ "কবিগুরু" এবং "মহাপুরুষ" তাঁর পক্ষে চোদ্দ বছর কনিষ্ঠ লেখককে ঈর্ষা করার কোনো কারণ নেই, উপরন্তু তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং ইত্যাদি।

এ যেন বানিয়ে লড়াই।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল, এ ব্যাপারে আমি সংশয় প্রকাশ না করেও সবিনয়ে নারায়ণবাবুকে প্রশ্ন করতে চাই, কোন্

যুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ "কবিগুরু"? বাল্মীকি, মাইকেল থাকতে আধুনিককালে একজন কবিকে কখনোই "কবিগুরু" আখ্যা দেওয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়। এবং পরোক্ষে এতে করে মাইকেলকেই অসম্মান করা হয়। দ্বিতীয়ত, মহাপুরুষ ব্যক্তিদের ঈর্ষা নেই, এবম্বিধ মন্তব্য লেখকের সৎ চিন্তাই শুধু উচ্চারিত করে। মহাপুরুষই হোন আর কাপুরুষই হোন, ঈর্ষাদ্বারা পীড়িত ও ঈর্ষাযুক্ত হওয়া মানুষের স্বভাব। রবীন্দ্রনাথ কিছু ব্যতিক্রম নন্। বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ঈর্ষা লোকপ্রবাদ সৃষ্টি করেছে। নারায়ণবাবু নিজেই স্বীকার করবেন শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এক সময় রবীন্দ্রনাথকেও ম্লান করে দিয়েছিল। গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়েরও সেই অভিমত। বৃহত্তর রবীন্দ্র যুগের অন্তর্ভুক্ত হয়েও শরৎ (এবং নজরুল) কী-জীবনধারণায়, কী-সাহিত্যাদর্শে সদর্থে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণ স্বীকার করেন নি (রবীন্দ্রকথা সাহিত্য প্রচুর পড়াশোনা করলেও), এটা মেনে নেওয়াই ভালো। এই অজ্ঞাত-কুলশীল, অভিজ্ঞতাহীন, একদা পেশায় কেরানী, নেশাখোর, বাউণ্ডুলে সাহিত্যিকের এই দিগ্বিজয় রবীন্দ্রনাথের মনে 'প্রফেশনাল জেলাসি' আনবে না, এমন মহাপুরুষত্বে আমি বিশ্বাসী নই।

প্রশ্নটা আরও গভীরে।

সেটা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যগত বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। র বী ন্দ্র-ধা র ণা য় শরৎচন্দ্রের সম্রাজ্যবাদ তথা সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি সাহিত্যের "চিরকালীনতা" "অমরত্ব" বিষয়েও শরৎচন্দ্র "সমসাময়িকতার দাবি"-কে উপেক্ষা করতে পারেন না। কলকারখানা আশ্রিত শ্রমিকজীবন শরৎচন্দ্রের কাছে বরণীয়, বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি রাশিয়ান সাহিত্যের নীচু তলার মানুষের জীবনের আদর্শ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন।

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের বিচারে এই মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে মনে রাখতেই হবে। তা না হলে আমরা অনর্থক লক্ষ্যভ্রষ্ট হব। ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ভালো সম্পর্ক থাকতেই পারে, যখন দুজনেই ভদ্র-লোক। স্থূল উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন সন্তোষ ঘোষ নারায়ণ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধুত্বের হলেও সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে কী উভয়ের বন্ধুত্ব টেকে?

আসলে দু জ ন সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র

শিরঃপীড়া নেই। দ্বন্দ্ব দুটি দৃষ্টিভঙ্গির। এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজ এবং দৃঢ়মূল শিকড়ের ন্যায় বঙ্গসাহিত্যে ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনিই শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের কাছে সাহিত্যের অথরিটি, স্ট্যাণ্ডার্ড। শরৎ সাহিত্যের প্রবণতা এই অথরিটি এবং স্ট্যাণ্ডার্ডকেই যেন আঘাত দিতে চায়।

এবং এখানেই রবীন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্র-ঘটিত সমস্যা।

'পথের দাবী' এবং ষোড়শী' নাটককে কেন্দ্র করে তা চিড় ধরে। পরবর্তীকালে এই চিড় জোড়া লাগে নি বলেই আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবত তাঁর নিজস্ব সাহিত্য বিশ্বাস থেকে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে অবনয়ন করেছেন। শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে যে লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে পাওয়া যায় তা হল "হৃদয় রহস্যে ডুব দেওয়া" চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয় "কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টি" "মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতা" জাতীয় কথার কারু-র্যের মধ্যে শরৎ-সাহিত্যের চিন্তার ও মননশীলতার দিকটি উপেক্ষা করা হয়েছে বলে মনে হয়। এবং লখনৌ সাহিত্য সম্মেলনে শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ, 'তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও।...সে ঢের ভালো।" এ মন্তব্যকে কী সরল অর্থে গ্রহণ করা যাবে? আমার তো মনে হয় এটা শরৎচন্দ্রের বৈদগ্ধ্যের প্রতি অকরুণ কটাক্ষ।

রবীন্দ্রনাথ পারস্পরিক সম্পর্কের এই পরিণাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মানসিক ক্ষতকে উপশম করার জন্যে প্রমথ চৌধুরীকে বাদ দিয়ে তাঁর জন্মোৎসবে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি হিসেবে সুপারিশ করেন। কবির 'কালের যাত্রা' নামক ক্ষুদ্র নাটিকা শরৎচন্দ্রকে উৎ-সর্গ করাটা শরৎ-প্রতিভার পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে? এমনকি 'সাধারণ মেয়ে' নামক শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিকেও উচ্চাঙ্গের ঠাট্টা বলেই ধরা যেতে পারে।

'আধনিক সাহিত্যের' প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র আধুনিকতার বকলমে সাহিত্যের দেহসর্বস্বতার প্রশ্নে কবির সঙ্গে একমত হলেও কল-কারখানা শ্রমিক-জীবন নিয়ে লেখা সাহিত্যের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেন নি। নারায়ণবাবু সমগ্র ব্যাপারটাকে গুলিয়ে ফেলেছেন বলেই আশঙ্কা হয়। অতুলানন্দ রায়কে লিখিত চিঠিটির বক্তব্য শরৎচন্দ্রের বলেই ধরতে হবে।

পরিশেষে শরৎচন্দ্রের রবীন্দ্র-ভক্তির প্রমাণ স্বরূপ বার্মায় কবির উদ্দেশ্যে মানপত্রটির প্রমাণ দাখিল করেছেন নারায়ণবাবু। তিনি সম্ভবত জানেন না

এবং আমিও সেদিন মাত্র জেনেছি শরৎচন্দ্রের অন্যতম গবেষক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এই মানপত্রের লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্রকে খারিজ করে দিয়েছেন এই যুক্তিতে যে এই ঘটনার আগেই শরৎচন্দ্র বার্মা ত্যাগ করেছেন। উপরন্তু মানপত্রের ভাষা বিচারেও তিনি লেখকের ভাষারীতির সঙ্গে এর ন্যূনমাত্র সাদৃশ্য স্বীকার করেন নি। যদিও মানপত্র-লেখক শরৎচন্দ্র হলেও আমাদের সিদ্ধান্তের কোনো হেরফের হচ্ছে না।

আবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি নারায়ণবাবুর শরৎ-সাহিত্য-প্রকৃতি বিচার লেখকের মূল্যায়নে আমাকে অনেক ক্ষেত্রেই সাহায্য করেছে। অন্যত্র প্রবন্ধে আমি তা স্বীকারও করেছি। যেখানে স্বীকার করতে পারিনে সেখানে বৃহত্তর পাঠকের জন্যেই আমাকে কলম ধরতে হয়। বলতে বাধা নেই এই ঔচিত্যবোধ আমার নারায়ণবাবুর কাছেই শিক্ষা।

ষোড়শী নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-ধারণা

সাহিত্যের অমরত্বের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িকতার দাবির উর্ধ্বে একজাতীয় 'চিরকালের সাহিত্যের' কথা ভেবেছেন। শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই স্থির ধারণার কথা তিনি পুনরায় ঘোষণা করেছেন। নগদ বিদায়ের লোভে সাহিত্য সৃষ্টির লোভ সম্পর্কে তিনি শরৎচন্দ্রকে সতর্ক করেছেন। অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, সমসাময়িকতার দাবিকে উপেক্ষা করে চিরকালের সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। এ ছাড়াও সাহিত্যের অমরত্ব-বিষয়েও শরৎচন্দ্র যথেষ্ট সন্দিহান। যুগের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী সাহিত্যের আবেদন বদলাতে বাধ্য। তাঁর মতে 'চিরকালের সাহিত্য' বলে বস্তুত কিছু নেই। দীর্ঘকাল টিকে আছে বলেই সেই সাহিত্য সর্বকালে, সর্বযুগেই বেঁচে থাকবে—এমন রক্ষাকবচ তার নেই। সাহিত্যে অমরতার ভান না করে সৎ সাহিত্যিক বিশ্বাস করবেন যে, এমন দিনও আসতে পারে যেদিন আগামী দিনের পাঠকের কাছে তাঁর সাহিত্য অকিঞ্চিৎকরতায় পর্যবসিত হবে। তাঁর কঙ্কালের ওপর আরো মহৎ সাহিত্য গড়ে উঠুক, এইটেই লেখকের শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা।

'ষোড়শী' নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পত্রাঘাত উদ্ধৃত করা গেল।

১

[রবীন্দ্রনাথের পত্র]

তোমার ষোড়শী পড়েছি। বাঙলা সাহিত্যে নাটকের মতো নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম ; কেননা নাটক সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইটিই যখন সত্য ভাবে মেলে, তখন চরিত্র-চিত্র

খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিক ভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার সেই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (পারস্‌পেকটিভ) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে, তবেই সাহিত্য টিকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশি করতে চেয়েচ এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছ! যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে, এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না.—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা ও কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ-পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তা রূপে তোমার কর্তব্য ছিল, এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চল্‌তি 'সেন্টিমেন্ট' মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার' পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোনো দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন, তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুশি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি—৪ ফাল্গুন, ১৩৩৪।

তোমার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২

[শরৎচন্দ্রের পত্র]

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণ ভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন! এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটি উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি, এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেছি— এ ঠিক হচ্ছে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয়, তখন ঠিক কি ভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধকরি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ মনে হয়, কিন্তু আর একদিকে ত্রুটিও আছে প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস, আপনি যাকে বলেছেন এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধহয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে! সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হল আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হল না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসা নিষ্ফল

করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লীসমাজ, এর বিক্রিও যত, খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে ততই মনে মনে লজ্জা পাই। জানি এ টিকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যায় জড়ানো। মিথ্যাও বরঞ্চ টেকে, কিন্তু সত্যের বনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময় আমি খুব ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ড, ওর ধড়, তার পা এক করে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়! কারণ যে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মতো এর একটু তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মতো লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়; এবং এই ফাঁকিটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এই জন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন শুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোনো বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই—এমনি। মাঝে মাঝে হয়ত অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে—তার ভাষাও যেমন, আড়ম্বরও তেমনি – কিন্তু তবুও মন খুশি হয় না, অথচ এরা বলে, এই ত সাহিত্য।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছি এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মতো যন্ত্রকে মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকদের রুচি ও বিচার-বুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে, তার কোনো নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং

ছবির 'পারস্‌পেকটিভ' এবং সাহিত্যের 'পারস্‌পেকটিভ' কথার দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নরনারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে- এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অন্তত অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতে গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা 'কংক্রিট' উদাহরণ দিই। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তার কত রকমের নাম, কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকে ভিড় করে চেয়েছিল এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধ কৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী 'পারস্‌পেকটিভ' বলতে কি আপনি এই ধরনের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন?

আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু একটি লিখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা না বোকা দর্শকরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড্‌ সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখছেন, 'তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।' আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মতো জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও শাস্তি দেয়।

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ

হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণ ভারি এলোমেলো—কোনো কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে পারিনে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জনা করবেন। ইতি ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৪

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[রবীন্দ্রনাথের পত্র]

কল্যাণীয়েষু,

আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাকো। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়—রাজ্য সাম্রাজ্য তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্তমানের কোনো প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি। বর্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্তলোকে এসেছে, তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে, সাপ্তাহিকে, সভা-সমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাখারিতে তৈরি; তোমরা সেখানে যদি পা দেও, তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ, 'উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার।' সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্তমান কালের একটা বৃহৎ অংশ আছে, যেটা ক্ষীণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক 'ডিমক্রাসি'র যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এ ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা। এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্বত্রই পুনরাবৃত্তির জন্যে

উন্মত্ত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়—তোমাদের খাঁচার পাখি না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে, কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎ কালে, বৃহৎ দেশে। দাশু রায়ের আমলে উপস্থিত কাল দাশু রায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে চেক সই করেছিল, আধুনিক কালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথা কাব্য লোকসাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশু রায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশু রায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েছে, এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করছে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেছে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েছি, তাতে তুমি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্তি দিয়েছ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগ দেগে দিতে পারেনি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে ভয় হয়, পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেছে। সে এতবড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে 'পারস্পেকটিভ'-এর কথা বলেছি, সে হচ্ছে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত, তার ভাষায়, চরিত্রের ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েছ, তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে, তাহলে ভাষায়, ঘটনায় অন্যরকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম, যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত, তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কিছু নেই—

যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোনোদিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ১১ মার্চ, ১৯২৮

তোমাদের—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখকের জীবনদর্শন ঃ শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ ঃ অনুষঙ্গ

শিল্পকর্ম যেহেতু ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি সেক্ষেত্রে তার লৌকিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকে স্মরণ রাখার প্রয়োজন। ব্যাপক জীবন ও মনুষ্য-প্রবাহের সম্পূর্ণ চিত্রটিকে তুলে ধরবার মতো ক্ষমতা ব্যক্তিমানুষের নেই। ফলত তাঁকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ বেছে নিতে হয় যেখান থেকে তিনি জীবনকে এমনভাবে নির্মাণ করেন যা গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর জীবনের আঙ্গিনাকে আলোকিত করে।

প্রকৃত শিল্পীর পক্ষে এই দৃষ্টিকোণ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। এবং এটিই তাঁর জীবনদর্শন তথা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। সংখ্যায় প্রকৃত শিল্পী যে সংসারে কম তার কারণ বেশির ভাগ তথাকথিত লেখক শুধুমাত্র বই লেখেন, সেখানে লেখক ব্যক্তিত্ব ও দর্শনের আভাসও মেলে না। এই লেখককুলের সমর্থনে কেউ কেউ শিল্পচরিত্রের ব্যাখ্যানে অবজেকটিভ সাবজেকটিভ জাতীয় সাহিত্যকর্মের বিভাগ দেখিয়ে দায় সারেন। তাঁদের মতে বিষয়লীন লেখা মাত্রই অবজেকটিভ, ব্যক্তিমুখী লেখা মাত্রই সাবজেকটিভ! কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা কী এতই সরল! সাহিত্য নিছক ঘটনার বর্ণনা নয়, ঘটনার কার্যকারণ এবং ঘটনাভুক্ত মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণই সাহিত্য। স্বভাবতই এই জাতীয় রচনায় লেখকের নিজস্ব উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হতে বাধ্য। তাহলে অবজেকটিভ সাবজেকটিভ এমন সরল বিভাজন একেবারেই বাজে। অধিকাংশ লেখক ঘটনাকে মুখ্য করে তার গভীর তাৎপর্যে পৌঁছতে পারেন না বলেই তাঁরা শুধু লেখক, স্রষ্টা শিল্পী নন।

সব দেশেই এই জাতীয় রচনাই বৃহত্তর বাজারের দাবী মিটিয়ে চলেছে। এবং যথার্থ শিল্পকর্মকে কোণঠাসা করে রেখেছে। এই সকল রচনাধারাকে সচল রাখবার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বশম্বদ আলোচকরা অবজেকটিভ রচনা বলে স্বস্তির ঢেকুর তুলছেন।

শরৎচন্দ্রের বহুপঠিত "মহেশ" গল্পের দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। মহেশ অবজেক-টিভ লেখা তো? অথচ শরৎচন্দ্র বিষয়লীন হয়েও এখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শনকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গফুর তার স্বশ্রেণীর প্রতিনিধি

চরিত্রে উন্নীত হয়েছে এবং তার পরিণতিও শ্রেণীগত দৃষ্টিরই পরিণাম। অন্য-দিকে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' নিছক পশুপ্রীতির প্রচলিত উদাহরণ। প্রসঙ্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পের হাতিটিকে মনে পড়ছে, এখানে লেখক, পশুর উর্ধ্বে তাকে একটি কালের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত এই তিনটি গল্পই অবজেকটিভ রচনা, জীবনদর্শনের কারণে প্রভাতবাবু ব্যতীত অন্য দুটি যথার্থ অবজেকটিভ হতে পেরেছে। আসল কথা ঘটনা-বাছার কারণ থেকেই লেখকের মনোভাব ও উদ্দেশ্য বোঝা যায়। বিশেষ করে শক্তিমান লেখকের পক্ষে তো বটেই। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' কী অবজেকটিভ গল্প? না কি আরোপিত? রবীন্দ্র-নাথের স্বশ্রেণীগত ধ্যানধারণামত রাইচরণকে তিনি 'আদর্শ ভৃত্য'-রূপে চিত্রিত করেছেন। তাহলে গল্পটিকে অবজেকটিভ না সাবজেকটিভ কী বলব? কিংবা শ্রেণীচেতনার কারণে একেক লেখকের একেক জাতীয় অবজেকটিভিটি গড়ে ওঠে?

বক্তব্যটি শেষ করি, অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ দৃষ্টিকে রচনার শরীর থেকে আলাদা করে দেখবার চেষ্টাটাই মূর্খতা।

গোড়ার কথাতেই আসি। নিজস্ব জীবনদর্শন ছাড়া প্রধান লেখক হওয়া যায় না। অথচ মুশকিল হচ্ছে এই যে প্রচুর বিষয়মাহাত্ম্য এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ, প্রাকৃতিক ঋতুবৈচিত্র্য, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরবোধ, দাও ফিরে সে অরণ্য-জাতীয় পশ্চাদ্‌পর সনাতন ধ্যানধারণার আকর্ষণে, দু' একজন শ্রদ্ধেয় লেখকের বিচার জটিল হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এমনি একটি জটিল সমস্যা। তাঁর অজস্র সৃষ্টির পিছনে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরবোধ এমন একটি বিশাল ছায়া ফেলে রেখেছে যে প্রগতিশীল সচেতন পাঠকের কাছে তিনি একটি পরম বিস্ময়! যেহেতু বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ রবীন্দ্র-নাথের কাছে সান্ত্বনা খুঁজে পাবেন। কিন্তু, কথাটা থেকেই যাচ্ছে, রবীন্দ্র-নাথের আসল জীবনদর্শন কী? তিনি কি ঈশ্বরভক্ত? তিনি কী আধ্যা-ত্মিক? তিনি কী উপনিষদীয় ভাবরসের আশ্রমিক লেখক? অথচ পর্বে পর্বে তিনি এমন বদলে যেতে পেরেছেন যে তাঁর সাহিত্যে বস্তুবাদী চিন্তা-ধারা যা প্রগতিশীল মানুষকেও প্রেরণা দিতে পারে তেমন বিষয়েরও অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথের যেন দুটি মুখ, একটি সনাতনী, অন্যটি প্রগতিকামী। এর একটিকেও বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ হতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী কথাটা যেমন মিথ্যা নয় তেমনি তিনি একক চেষ্টায় সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে বস্তুবাদী ধারণার দিকে অন্তত শেষ পর্বে এগিয়েছেন সেটিও মিথ্যা নয়। জীবনের অধিক কাল তিনি রবীন্দ্র মণ্ডল জাতীয় স্তাবকতার এক কুসুম-কারাগারে বন্দী থেকে তিনি যা হাতে পারতেন তা হতে পারেন নি। শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং সহজেই 'গুরুদেব' বনে যাবার পিচ্ছিল সড়কে তিনি বারবার পা হড়কে পড়ে গেছেন। যার থেকে বেরিয়ে যাবার প্রয়াস শেষ পর্বে দেখা গেলেও তাঁর মৃত্যুর পর সে প্রয়াসকে অন্ধমণ্ডলী পাথরচাপা দিয়ে আটকে রেখেছেন। শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ কি চিন্তা করছিলেন, তাঁর প্রগতিচিন্তার সমূহ প্রমাণ, দলিল, রচনা, পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহকে লোকচক্ষুর আড়াল করবার সচেতন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। তরুণ গবেষক এই নতুন দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে গিয়ে এস্টাব্লিশমেণ্টের পাথরের দরজা থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শান্তিনিকেতনের মতো একটা অ্যানাক্রনিজমকে টিকিয়ে রাখতে স্বয়ং কবিকে অস্থানে কু-স্থানে অযোগ্য ব্যক্তিকেও নির্বিচারে ছাড় দিতে হয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে কবিকে শান্তিনিকেতনের জন্যে প্রয়োজনহীন হাত ময়লা করতে হয়েছে। অথচ রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের অভাবে সব আশ্রমের মতোই শান্তিনিকেতন যে শুকিয়ে যেতে বাধ্য হবে, সেকথা রবীন্দ্রনাথ একদা বুঝতে পারলেও তাঁর আর কিছু করার ছিল না।

কথাটা কী বোঝানো গেল যে জীবনদর্শন ছাড়া সত্যিকার শিল্পী গড়ে ওঠে না? আসলে নাটক-কবিতা-গল্প-উপন্যাস যাই বলুন তা দীর্ঘস্থায়ী হয় শিল্পীর বিশিষ্ট জীবনদর্শনের কারণেই। শিল্পের জন্যে শিল্প-জাতীয় বিশুদ্ধমার্গীরা জীবনদর্শনের আসল ব্যাপারটা চাপা দেবার প্রয়োজনেই ফাঁকিবাজি শ্লোগান দেন।

এখন দেখতে হবে লেখক গতানুগতিক ভাববাদকেই তাঁর জীবনদর্শন বলে চালাতে চান কি না। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের পঁচানব্বুই ভাগ ভাববাদী অর্থাৎ সেই ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরভজন —যা প্রচলিত সনাতন চিন্তাধারাই সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের এই অংশটি নিশ্চই ঐতিহ্যপন্থী এবং পরোক্ষে স্থিতস্বার্থেরই পক্ষপাতী। অধিকন্তু তাঁর মনোভূমির বহুতর অংশ ফিউডাল চিন্তার বাইরে যেতে পারে নি। গ্রাম্যপ্রকৃতির জন্যে তাঁয় রচনায় বারবার আগ্রহ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এমন কি

য়ুরোপীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতিও তাঁকে তেমন করে উৎসাহিত করতে পারে নি। ফিউডালিজম বনাম য়ুরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের দ্বন্দ্বে তিনি ফিউডালিজমের দাসত্ব করেছেন।

ফলত রবীন্দ্রসাহিত্য অধিক পরিমাণে সনাতনী ভাববাদেরই পরিপোষক। তাঁর চিন্তায় ও কর্মে এর বাইরে যাবার চেষ্টা খুব কমই দেখা গেছে। একজন ফিউডাল জমিদার তাঁর দোষগুণ সমেত রবীন্দ্রনাথে বর্তমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অবিকল রেখে তিনি সমবায় প্রথার কথা ভেবেছেন, ট্রাকটারে জমিচাষের কথা ভেবেছেন, গ্রামের উন্নতির কথা ভেবেছেন। আমাদের ছোটবেলায় এমন অনেক 'আদর্শ' জমিদারের কথা জানি যাঁরা গ্রামের উন্নতির জন্যে ইস্কুল খুলেছেন, পোস্টাপিস করেছেন, চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। কিন্তু কথাটা ভালো-মন্দ জমিদারের কথা নয়, কথা হচ্ছে জমি-দারি ব্যবস্থাটাই অন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তা বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বোঝেননি তা নয়! স্বশ্রেণীগত দুর্বলতায় তিনি ভালো-মন্দ জমিদার জাতীয় সুবিধাবাদে আক্রান্ত ছিলেন। 'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় যার আছে ভুরি ভুরি'—ইত্যাকার দার্শনিকতায় তিনি বুঁদ ছিলেন। এই শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা তাঁর চিন্তাকে ঐতিহ্যপন্থী, পরিবর্তনবিমুখ করেছে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানবিকতা ইত্যাদির আড়ালে তিনি দেশের প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্রব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। (স্মরণীয় শান্তিনিকেতন-এ রাজনীতির কোনো স্থান ছিল না!) সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্বটাকে তিনি অগ্রাহ্য করে শ্রেণী-সমন্বয়ের সাধনা করে গেছেন।

এ সবই স্বাভাবিক। এর পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে গেঁথে নিতে হবে। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, আশ্রম ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ঐতিহ্যা-নুযায়ী। এগুলি কম বেশি তাঁর ধ্যানের বস্তু। পর্যন্ত প্রচলিত মূল্যবোধ গুলিকেও তিনি কৃপণের মতো আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ঈশ্বরপ্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন তাদের এক হবার জন্যে ভগবানের কাছেই আবেদন করেছেন! হিজলী জেলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে তিনি উভয় পক্ষকেই সংযত হবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন! অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব 'ঘরে বাইরে' 'চার অধ্যায়' এবং বিভিন্ন পত্রাবলীতে পরিষ্কার। তিনি একদা ভগিনী নিবেদিতাকেও বিপ্লবের সংস্পর্শ পরিহার করবার জন্যে

সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি গঠনমূলক কাজ ও শিক্ষাবিস্তারের ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন, যা তাঁর সংস্কারপন্থী ঝোঁকেরই পরিচায়ক।

পাশাপাশি শরৎচন্দ্রের রাষ্ট্র শিক্ষা-সমাজ- সংস্কৃতি চিন্তাকে বিচার করে দেখা চলে। 'পথের দাবী' ও 'স্বদেশ ও সাহিত্যের' নানা রচনায় শরৎচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে চেহারা উদ্‌ঘাটন করেছেন তা তাঁর সঠিক রাজনীতিমনস্কতারই পরিচায়ক। দেশের স্বাধীনতার জন্যে আবশ্যক হলে সশস্ত্র বিপ্লবকেও তিনি অভ্যর্থনা করেছেন। ইংরেজি শিক্ষার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকেও তিনি সচেতন সমাজবিজ্ঞানীর মতো উদ্‌ঘাটন করেছেন। (দ্রষ্টব্য 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ।)

অচলায়তন সনাতন সমাজব্যবস্থাও তাঁর আক্রমণের বাইরে থাকে নি। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, আশ্রম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব 'চরিত্রহীন' 'পথের দাবী' এবং বিভিন্ন পত্রে পরিষ্কার। শাজাহানের প্রেমের সৌধ তাজমহল, তথাকথিত আত্মা, সতীত্ব, বৈধব্য সম্পর্কেও তাঁর র‍্যাডিকাল চিন্তা বিস্ময়কর। অরক্ষণীয়া, বামুনের মেয়ে, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ প্রভৃতি রচনায় সমাজব্যবস্থাকে তিনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। লেখক হিসেবে বিশেষ সুবিধে দাবী না করে' সামাজিক মানুষ রূপেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে বিপ্লবী কর্মীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছে। পথের দাবীর পর শেষ প্রশ্ন তাঁর প্রধান সাহিত্যকর্ম, যেখানে সচেতনভাবে তিনি এক জাতীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছেন। বস্তুত হৃদয়ধর্মের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠা তাঁর সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের ভাব-বাদী চর্চার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ঠা সে যুগে একটি বিরল ঘটনা বলে গণ্য হওয়া উচিত।

১৯১৩এর ৩০ সেপ্টেম্বর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম পুস্তক 'বড়দিদি' থেকে ১৯৩৮এর ১৬ জানুয়ারী মৃত্যু—শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবন। আরো সংক্ষেপে ১৯১৬এর মে' মাসে বার্মা থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যিক কার্যকলাপের সীমানা। মাত্র ২২ বছর। চির-কালই অসুস্থ মানুষ, শেষের বছরগুলিতে তাঁর কর্মক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি ১৯২৬।২৭ এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছে। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ। বস্তুত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে

আগমনের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বনেদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত। শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্র প্রতিভার কিরণে হারিয়ে যান নি এতে তাঁর সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবির্ভাব মাত্র তাঁর জনপ্রিয়তা যে রবীন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে গেল এ ঘটনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা যায় সমালোচকদের মধ্যে তাঁর এই অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ-স্বরূপ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে হৃদয়ধর্মের প্রাচুর্য তথা ভাবালুতার কথা বলা হয়। এই কথা বলে তাঁরা শরৎসাহিত্যের শস্তা অবনয়ন করেন। হৃদয়ধর্মের প্রাচুর্যে আপত্তির কি আছে? দেখতে হবে এই হৃদয়ধর্ম যুক্তি ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে গেছে কি না! রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, মেজদিদি—জাতীয় লেখকের গার্হস্থ্যরসের রচনাগুলিতে যে ভাবালুতা রয়েছে তা কী বাতাবরণ ও চরিত্রকে অস্বাভাবিক, অবাস্তব করে তুলেছে? এগুলি কি একদা আমাদের একান্নবর্তী সংসারের আবেগে-স্নেহে-ঔদার্যে মেশানো চিত্র নয়? পরবর্তী-কালে পারিবারিক সম্পর্ক 'cash payment'এ পরিণত হলেও মধ্যবিত্ত সমাজে আর্থিকতাশূন্য এ জাতীয় মধুর সম্পর্কের অভাব ছিল না। আমরা কী নতুন সমাজব্যবস্থাতেও এই ধরনের প্রীতির সম্পর্ককে আকাংক্ষা করতে পারি নে? আমার তো মনে হয় পারিবারিক সম্পর্কের এই মানবিক দিকগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতেও নতুন সমাজ গঠনের লক্ষ্য থাকা উচিত।

কাজেই ওই কাহিনীগুলি নিছক সেনটিমেণ্টাল বলে উড়িয়ে দেওয়াটা এক-ধরনের বুর্জোআ সবারি ছাড়া কিছু নয়।

সমাজ-সমস্যামূলক বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ প্রভৃতি রচনা-গুলিতে যে জলন্ত সামাজিক প্রতিবাদ রেখেছেন লেখক তার যুক্তিনিষ্ঠা ও বিচার বুদ্ধির বিশ্লেষণতাকে আমরা কোন স্পর্ধায় অস্বীকার করি? এদেশের পণ্ডিত সমাজ মনেপ্রাণে পরিবর্তনবিমুখ স্থিতস্বার্থের পাহারাদার, শরৎচন্দ্রের এই র‍্যাডিকাল ভূমিকায় তাদের যথেষ্ট বীতরাগ। সাহিত্য তাঁদের কাছে 'শিল্পের জন্যে শিল্প', অর্থাৎ সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্ব পালনে তাঁরা বিশ্বাসী নন। পণ্ডিত সমাজের প্রতি অশেষ অনুকম্পার সঙ্গে বলতে হয়, শরৎচন্দ্র সাহিত্যকে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপেই ব্যবহার করেছেন।

সমাজ সম্পর্কে তার এই ক্ষুরধার জিজ্ঞাসাগুলিই তাঁকে রাজনীতি সচেতন করেছে, প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার বিবদমান শিবিরকে তিনি চিনিয়েছেন,

ভাববাদী সনাতন ধ্যান ধারণার আড়ালে বৃহত্তর মানুষের শোষণের ধাঁধা-টাকে তিনি পরিষ্কার করতে চেয়েছেন।

না, ধর্ম-ধর্মগ্রন্থ-আশ্রম, বাতিল মূল্যবোধগুলিকে আশ্রয় করে নয়, রাশিয়ার সাহিত্যের মতো এদেশের সাহিত্যকে নিচুতলার মানুষের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এদেশের সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সেখানেই নিহিত।

সাহিত্যে অমরতার ভান তিনি করেন নি। নির্মম উদাসীনের মতো তিনি আশা পোষণ করেছেন আগামীতে আমাদের দেশে আরো উন্নত সাহিত্য গড়ে উঠুক যেদিন তাঁদের সাহিত্যও সেদিনের মানুষের চোখে অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠবে। সাহিত্যকে ট্রাস্ট গঠন করে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবসায়িক প্রবণতাকে তিনি হেলায় উড়িয়ে দিতে পারেন।

মাত্র ২২ বছর সাহিত্যিক আয়ু নিয়ে শরৎচন্দ্র একক চেষ্টায় অপ্রস্তুত সমাজব্যবস্থায় যথেষ্ট বৈপ্লবিক উদ্যম দেখিয়েছেন। কোথাও কোথাও স্ববিরো-ধিতা দেখা গেলেও ছিদ্রান্বেষীর মতো তাকে বড় করে না দেখে যদি তাঁর অসমাপ্ত কার্যকে আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে তাঁর অশান্ত চিত্ত কিছুটা তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার চাবি

গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচর্চাকে বৃহত্তম রবীন্দ্রযুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির নির্বাচিত কবিতার ইংরাজি তর্জমার জন্যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। আর, একই বছরে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে লেখকের জন্যে সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন সংরক্ষিত হল। ১৯১৬এর মে মাসে বার্মা মুল্লুক থেকে স্বদেশে পাকাপাকি স্থিত হবার আগেই ১৯১৪, ১৯১৫, এবং ১৯১৬এর ১২ মার্চের মধ্যেই তাঁর 'চন্দ্রনাথ' পর্যন্ত গ্রন্থাকারে বেরিয়ে গেছে। তারপর ১৯১৬এর ৫ জুন 'বৈকুণ্ঠের উইল' এবং ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫; ১৯৩৭-এ (শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ) লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী। পাঠকেরা লক্ষ্য করতে পারেন একই বছরে কয়েক মাসের ব্যবধানে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর।

বিষয়টিকে সাজিয়ে দিতে গেলে এই রকম :

১৯১৪ ॥ বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, পণ্ডিত মশাই

১৯১৫ ॥ মেজদিদি

১৯১৬ ॥ পল্লীসমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া

১৯১৭ ॥ শ্রীকান্ত (১ম), দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন

১৯১৮ ॥ স্বামী, দত্তা, শ্রীকান্ত (২য়)

১৯২০ ॥ ছবি, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে

১৯২৩ ॥ দেনা-পাওনা

১৯২৪ ॥ নারীর মূল্য, নববিধান

১৯২৬ ॥ হরিলক্ষ্মী, পথের দাবী

১৯২৭ ॥ শ্রীকান্ত (৩য়), ষোড়শী

১৯২৮ ॥ রমা

১৯২৯ ॥ সত্যাশ্রয়ী; তরুণের বিদ্রোহ

১৯৩১ ॥ শেষ প্রশ্ন

১৯৩২ ॥ স্বদেশ ও সাহিত্য

১৯৩৩ ॥ শ্রীকান্ত (৪র্থ)

১৯৩৪ ॥ অনুরাধা, সতী ও পরেশ, বিরাজ বৌ (নাটক), বিজয়া

১৯৩৫ ॥ বিপ্রদাস

১৯৩৭ ॥ শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ

এমন অপ্রতিহতপ্রকাশ এবং লেখকের জীবিত কালেই অসংখ্য সংস্করণ শরৎচন্দ্রের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। লেখকের পক্ষে রাতারাতি এই ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করেছিল। এর কারণ কী রবীন্দ্রনাথের প্রধান মাধ্যম কবিতা, আর শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্য ?

এই বিস্ময়কর ঘটনাটাই আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই।

শরৎচন্দ্রের আগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার আয়োজনটি সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় ইংরেজি কায়দাদুরস্ত অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনেকটা শ্বেত পাথরের থালায় ইতরজনের আস্বাদের বাইরে পরিবেশিত সন্দেশের মতো। পান্তাভাত আর মুড়ি-খাওয়া সাধারণের জন্যে নয়।

উপমা-সহ বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার ধরনটা ছিল অনেকটা জমিদারি সেরেস্তার ধাঁচে। মাথার উপরে উদার কর্তা-মশায়কে ঘিরে একটি গুণগ্রাহী গোষ্ঠী, কেউ চাকরির সূত্রে কর্মচারী. কেউ বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়, কেউ সহৃদয় বন্ধু। সমস্ত পরিবেশে এক-সূর্যের মতো বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে বন্ধন টিঁকে আছে কবির অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েই। এটা ভালো কী মন্দ সে-প্রশ্নে না গিয়ে আমরা শরৎ-সাহিত্যচর্চার বিপরীত দিকটা তুলে ধরতে চাই।

শরৎচন্দ্রই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম হোল্‌-টাইমার। লেখা ছাড়া তাঁর আর দ্বিতীয় জীবিকা ছিল না। এবং এই লেখাই যে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সে সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন করবেন না। লেখার সঙ্গে যখন পাঠকের সম্পর্কটা রয়েছে তখন মসীজীবী শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যের বিষয়বস্তুর কথা নিয়তই ভাবতে হয়েছিল। এবং সেই কারণেই তিনি য়ুরোপ থেকে আগত 'গণতন্ত্র' বলে যে কথাটা রয়েছে, তিনিই সেই কালের গণতান্ত্রিক লেখক।

সেদিক থেকে শরৎ সাহিত্য-প্রয়াসকে সরল অর্থে রবীন্দ্রযুগের আওতার মধ্যে টেনে আনাটা সমীচীন হয় না। কী-ব্যক্তিগত কী-সাহিত্যগত ধ্যানধারণায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো মিল নেই। তার অর্থ এই নয় যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনো ভাবে ঋণী নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গুরুকল্প, কবির কথা-সাহিত্যের প্রভাব তাঁর সাহিত্য-জীবনে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। বাঙলা দেশে কোন্ লেখক আছেন যিনি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আশ্চর্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে পারেন?

কিন্তু কথাটা থাকছেই। সেটা এই, বৃহত্তর রবীন্দ্রযুগের ফ্রেমে শরৎচন্দ্র তথা নজরুলকে মেলাবার চেষ্টা করে আমরা যেন এই ভুল না করি যে এঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঐতিহ্যকেই বহন করছেন! রবীন্দ্রযুগমানস বলে সমালোচকগণ যদি কিছু চিহ্নিত করতে চান, শরৎচন্দ্র-নজরুল সেখানে ধরা পড়বেন না। তাহলে কোন্ ভরসায় আমরা শরৎচন্দ্রকে বৃহত্তর রবীন্দ্র-যুগের অন্তর্ভুক্ত করব?

আসল কথাটা এই, শরৎচন্দ্র বৃহত্তর পাঠকের সাহিত্য-তৃষ্ণার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে মেলাতে পারলেন। নিম্নবিত্ত মানুষ, শহরে-গ্রামে; স্ত্রীশিক্ষার আনুকূল্যে, শরৎচন্দ্রের রচনা সহজেই অন্তঃপুরকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো অধিকার করল।

কথাটা পরিষ্কার করে বলাই ভালো। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-প্রকাশের সঙ্গেই নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তুললেন। এ পাঠকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপীয় ভাবেলালিত অভিজাত শ্রেণীর সম্পর্ক নেই। এ পাঠক মনেপ্রাণে দেশের মৃত্তিকায় লালিত-পালিত, খাঁটি বাঙালী। শরৎচন্দ্র শুরু থেকেই দেশের মাটির ওপর পা রেখেই সাহিত্য সেবা আরম্ভ করেন। শরৎচন্দ্রের জাদুকরী লেখনীর স্পর্শে আপাত-গতিহীন-বৈচিত্র্যহীন বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁদেরি নিত্য পরিচিত তুচ্ছ ঘরোয়া বন্ধনের পড়ে-যাওয়া দর্পণটাকে যেন নতুন করে খুঁজে পেলেন। এবং দরদী কথা সাহিত্যিকের স্পর্শে নির্যাতিত মূক বিধবাদের বেদনা যেন পবিত্র ঘণ্টার মতো দিগন্তকে গম্ভীর ধ্রুবপদ সঙ্গীতের মতো সিক্ত করে রাখল। কথাটা অপ্রাসঙ্গিক না হলে ভেবে দেখা চলে শরৎসাহিত্যই পরোক্ষে মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যে কমবেশি পড়াশোনার চর্চার প্রেরণা জুগিয়েছিল। আমাদেরি শৈশবে আমাদেরি

তথাকথিত অশিক্ষিত মা-জ্যাঠাইমাদের সুদূর গ্রামাঞ্চলে গোগ্রাসে শরৎচন্দ্র পড়তে দেখেছি। যেকালে অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে এক রকম লেখাপড়া নিষিদ্ধ বস্তু, সেকালে একমাত্র স্বচেষ্টায় এমন বিস্ময়কর প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দন-যোগ্য। কৃত্তিবাসের পরে বাঙলা দেশে নারীজাতির মধ্যে এমন জনপ্রিয়তা শরৎচন্দ্রের পক্ষেই ঘটেছে।

শরৎচন্দ্র প্রখর আত্মবিশ্বাসী লেখক এবং পাঠক সম্পর্কে বরাবরই সচেতন। সাহিত্যকর্মের স্বতঃস্ফূর্তিতে তিনি বিশ্বাসী নন (দ্রুত লেখা কেরানীর গুণ), যা লেখেন তার জন্যে পরিশ্রমে কুণ্ঠা নেই, অবান্তর এড়িয়ে যান, অদ্ভুত পরিমিতিবোধ। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, রচনাশৈলী এবং ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর মনোযোগ লক্ষণীয়। পাঠকের গ্রহণক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাঁর ভাষাকে সহজ অথচ তাৎপর্যে গভীর বিরল-সৌন্দর্য প্রদান করেছে।

বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধু গদ্যকেও তিনি মেদ-চর্বিহীন ঋজু, সতেজ ও প্রাণবান করে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'অলংকার-উপমাবহুল স্যাকরার দোকানের সাজানোর রুচি, যেখানে logic বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে', তাকে তিনি সমর্থন করেন নি। 'সবুজপত্র' তথা রবীন্দ্র গোধুলিপর্বের চলতি গদ্য যে তাঁকে আকর্ষণ করে নি তার মূলে সেই পাঠকসচেতনতা, তাঁদের কাছে সবুজপত্রের হালকা বৈঠকী বা রবীন্দ্রনাথের লিরিকময়তা কৃত্রিম বলে বোধ হত। ভাষা, বিষয়, চরিত্র শরৎ-সাহিত্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। শরৎচন্দ্রের বর্ণনামূলক সাধু গদ্য জড়স্তূপের মতো পড়ে নেই, এ গদ্য যেন জীবন্ত প্রাণীর মতো সচল। উদাহরণ স্বরূপ 'রামের সুমতির' এই অংশটুকু লক্ষ্য করা চলে "একদিন ভাত খাইতে বসিয়া উঃ আঃ করিয়া বার দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল।" রামলালের পর পর কাজগুলো বোঝাবার জন্যে শরৎচন্দ্র একই বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার কী সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন! আর তারি ফলে রামের বেপরোয়ামির ওপর পাঠক-মনে সকৌতুক সহানুভূতি এনে দিয়েছেন। এই সাধু গদ্যের ব্যবহার রামের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এখানে চলতি ভাষা ব্যবহার করলে বাক্যটিকে খণ্ডখণ্ড করে ছোটো করা যেত, কিন্তু রামের কার্যকলাপের মজাটাকে বোঝানো যেত না! 'অরক্ষণীয়া'র ভাষার চমৎকারিতার উদাহরণ এই সঙ্গে মনে পড়ছে। যেখানে জ্ঞানদা নিজেই মুখে রঙচঙ মেখে কনে হিসেবে পাত্রপক্ষের কাছে নিজেকে উপস্থিত করছে 'খান্‌কিরাও যে সাজ

দেখলে লজ্জা পেত'। ভাষার এমন নির্মম সার্থক ব্যবহার, যার মধ্যে চরিত্রের ভয়াবহ মানসিক অবস্থা বেরিয়ে আসছে, শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কে করতে পেরেছেন!

এ তো গেল বর্ণনার অংশ, যে চলতি সংলাপ লেখক চরিত্রানুযায়ী ব্যবহার করেছেন তার পরিমাপ কী দিয়ে করা যাবে? বিশ্ববিখ্যাত বড় বড় লেখকের ক্ষেত্রেও সংলাপ-ব্যবহার সমালোচনার বাইরে যেতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথও সংলাপ প্রায় পরিহার করতে ভালোবেসেছেন, যেখানে পারেননি সেখানে সংলাপ কৃত্রিম হয়ে উঠেছে, শরৎচন্দ্রই এক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ একটিই, চরিত্র এবং সংলাপ একই স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

অগ্রজ সমালোচক নারায়ণ চৌধুরীর পর্যবেক্ষণলব্ধ এই সিদ্ধান্তটি আমি নির্ভুল বলে মনে করি যে, লেখক শরৎচন্দ্রের জীবন এবং সাহিত্যের প্যাটার্ন সম্পূর্ণ ওয়েস্টার্ন। জীবনের বিচিত্র পথে কাদা ঘাঁটতে হয়, অথচ কাদায় গেঁথে গেলে চলে না. জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, ইজিচেয়ারে বসে সাহিত্যিক হয় না, অভিজ্ঞতার সঙ্গে চাই অধ্যয়ন, লোক-চরিত্রের মধ্যেই হোক, অথবা পুঁথির মধ্যেই হোক। সমাজ, মানব চরিত্র, রাজনীতি, শিল্পনীতি সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা তথাকথিত ভারতীয় সংরক্ষণশীল মানসিকতার সীমায় আটকানো নয়! তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীর। কোন কোন ক্ষেত্রে ডিকেন্স, টলস্টয়, দস্তয়ভসকি, গোর্কির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিতে সাদৃশ্য খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য নয়! ভারতীয় ঋষি রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি যে কৃতজ্ঞতা বোধ করেন নি সেটাও স্বীকার্য। কিরণ, কমল, অভয়া, ষোড়শী —এই সব চরিত্রের মানসিকতা কী ভারতীয়?

জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর সোচ্চারকণ্ঠ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, বিশেষ করে প্রগতির অংশ, তরুণ, বিদ্রোহী, ছাত্রসমাজ অতি সহজেই তাঁর পাশে সমাবিষ্ট হয়েছিলেন।

এবং সে সময় থেকেই লেখকদের দুটো স্পষ্ট শিবির ভাগ হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতীয় ভাববাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত শাশ্বত, চিরন্তন, সত্য, শিব, ধারণাকে আঁকড়ে ধরে' সাহিত্যে যন্ত্রসভ্যতা, কল-কারখানা-প্রমুখ আধুনিকতাকে খারিজ করে' একটি সাহিত্যের মাত্রা নির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। অন্য পক্ষের নেতা স্বভাবতই শরৎচন্দ্র, যিনি কলকারখানা-আশ্রিত শ্রমিক জীবনের তো বিরোধী ননই, বরং ঘোষণা করলেন যতদিন না আমাদের

সাহিত্য রাশিয়ান সাহিত্যের মতো নীচুতলার গভীরে নেমে আসতে পারছে ততদিন বাঙলা সাহিত্যের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কাজে কাজেই তরুণ লেখক সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের পতাকাতলে আসীন হলেন।

কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার তথাকথিত কল্লোল গোষ্ঠির লেখকদের উদ্ভট দেহবাদী যৌনবিকারকে তিনি কোনোদিন সমর্থন করেন নি। শরৎচন্দ্রের মতে বৃহত্তর জীবনে অন্যান্য সমস্যাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টায় এইসব লেখকেরা অভিজ্ঞতাহীন যৌনতার উত্তেজক চিত্রকে তুলে ধরে হাস্যকর বাহাদুরিতে মেতে উঠেছিলেন। সাম্প্রতিক বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠির কর্মচারী-লেখকদের হালফিল রচনা দেখে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য নতুন করে মনে পড়ে।

সাহিত্য সম্পর্কে প্রচণ্ড গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি শরৎচন্দ্রকে যোদ্ধা-সাহিত্যিকে পরিণত করেছিল। বহির্ভারতে থাকতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর শোষণের চরিত্র সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ দেশের প্রধান লেখকদের মধ্যে তাঁর মতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও জেহাদ আর কেউ তাঁর সৃষ্টিকর্মে ঘোষণা করতে পারেন নি। এই সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতাই তাঁকে সক্রিয় রাজনীতিতে এনেছিল। দেশের স্বাধীনতার জলন্ত প্রশ্নটি তিনি ভুলতে পারেন নি। কংগ্রেসের মুক্তি আন্দোলনে তাই তিনি দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গী। কংগ্রেসের বিপ্লবী অংশের প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ। 'পথের দাবী' রচনার মাধ্যমে তিনি বিপ্লব পন্থার সক্রিয় সমর্থক। এমন কি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রমাণ স্বরূপ তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কথাও চিন্তা করেছেন 'পথের দাবী'তে।

রবীন্দ্রনাথের গোষ্ঠিবদ্ধ সাহিত্য-ধারণার বিপরীতে বাঙলা দেশ এমনি একজন সাহিত্যিক ও কর্মীকে খুঁজছিল যা শরৎচন্দ্রের মধ্যে পাওয়া গেল।

শরৎচন্দ্রের অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে এই সূত্রগুলিই কাজ করে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস॥

ছোটগল্প : দ্বিতীয় চিন্তা

ছোটগল্প পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বাঙলা ছোটগল্প সম্পর্কে আমার আগ্রহ, কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ প্রশ্নটা আমাকে বারবার আন্দোলিত করে যে, এদেশে মপাসাঁ বা শেখভের জন্ম সম্ভব হল না। তার কারণ সামাজিক, যেহেতু ছোটগল্পের পসরা সাজিয়ে এদেশে বাঁচা একান্তই অসম্ভব। তাই দেখা যায় আশ্চর্য প্রতিভাদীপ্ত ছোটগল্পকারগণও বাধ্য হয়ে উপন্যাস নামক ব্যবসায়িক-সফল রাক্ষসের হাতে বাঁধা পড়ছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু বা বিমল কর কী তার বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত নন।

এই দুর্ঘটনার পরিণামে ছোটগল্পের একমাত্র স্থান পত্রিকার গর্ভে এবং সেখান থেকে শিশু আর গ্রন্থজাত হয়ে সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পারে না।

তরুণদের কথা বাদ দিলাম, ক'জন নবীন লেখকের গল্পগ্রন্থ এই ক'বছরে বেরুবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তার আর সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। যে মুষ্টিমেয় গল্পগ্রন্থ বেরুচ্ছে সেগুলি উপন্যাস পাবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রকাশকদের দায়ে-পড়া প্রকাশ।

এর কারণ কী বাঙালী পাঠকসমাজ ছোটগল্প চান্ না? বাঙলার ছোট-গল্পের যে গৌরবমণ্ডিত চূড়া বিশ্ব-সাহিত্যকে স্পর্শ করবার স্পর্ধা রাখে! বাঙলাদেশে কি সত্যই সদর্থে খুব বেশি উপন্যাস লেখা হয়েছে! কে অস্বীকার করবে সেগুলি জীবনধারণের তাগিদে লেখা বড় গল্প মাত্র।

আমাদের শ্লাঘার বিষয় একক রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বাঙলা ছোটগল্পের শৈশব কৈশোর যৌবন এসেছে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রবিরোধিতার চেষ্টায় আমরা অনেক আস্ফালন করেছি, পরিবর্তে নূতন কোনো ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারি নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু শত্রুভাবে রবীন্দ্রনাথকেই ভজনা করেছেন। আঙ্গিক এবং রচনাশৈলীর প্রসঙ্গেও। যদি দেহবাদের অন্তঃসারশূন্য বিদেশীআনাকে খারিজ করে দিই।

এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রবিরোধিতার ব্যাপারে যুবনাশ্ব, জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই সবিশেষ উল্লেখ করা চলে। যেহেতু এঁদের গল্পে নির্ভুল একটি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যগোচর হয়, যা অরাবীন্দ্রিক। সেটা এই 'প্রেমিক মানুষের' পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক মানুষের' পদপাত। এটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের বিরুদ্ধে একটি পজিটিভ বক্তব্য। গল্পের লিরিক আবহও বর্জিত হল। মন্ময়তার বিরুদ্ধে তন্ময়তা। এইভাবে এই লেখকদের চেষ্টায় বাঙলা গল্পে একটি বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠল। এমনকি প্রকৃতিকে দেখবার কাব্যিক আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটল। জগদীশ গুপ্তের গল্পে জীবনের ভয়ংকর জটিলতা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। তারাশঙ্কর গ্রাম প্রকৃতির crude, brutal রূপ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর রুদ্র নয়নে আঁকলেন। মানিক বিজ্ঞানীর নিরাসক্তিতে মানুষের অন্ধকার মনের আয়তনটি তুলে ধরলেন। জীবনকে এইভাবে বিশ্লেষণ রবীন্দ্র-ছোটগল্পে ইতিপূর্বে ধরা পড়েনি। আমরা দেখলুম ক্ষুধা পাশবিকতা লোভ-লালসায় বিচিত্রবর্ণ মানবসত্তার আর এক রূপ। এবং অর্থনীতির দুঃশাসনে ভাঙাচোরা মানুষের পরিণাম ও পরিণতি।

অতঃপর ভাবা গেল বাঙলা ছোটগল্পে একটি বাস্তববাদী ধারার সূত্রপাত এবং এই খাতেই এবার নতুন গল্প প্রবাহিত হবে।

এরপরই আশ্চর্য প্রতিভাবান সুবোধ ঘোষকে পেলুম। যা প্রকাশ্যে এবং ভাবনায় ধনবাদী সমাজ কাঠামোকে গল্পের শরীরে মূর্ত করে তুলল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ—দাংগার পটপ্রেক্ষণায় একদল শক্তিশালী কুশলী গল্পকারের আবির্ভাব ঘটল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্বে নতুন প্রচ্ছদে আমাদের চমকে দিলেন। এলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক, রমেশচন্দ্র সেন, সমরেশ বসু এবং অসংখ্য শক্তিশালী গল্পকার। এঁদের মুখপত্র হল পরিচয়, অগ্রণী, নতুন সাহিত্য, সাহিত্যপত্র, চতুষ্কোণ—সাময়িক পত্রিকাগুলি।

বোধকরি এইটেই বাঙলা ছোটগল্পের স্বর্ণময় যুগ। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাংগার ঐতিহাসিক দলিল লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে এই যুগের ছোটগল্পে।

তারপর রক্তক্ষয়ী দাংগার পথে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা এল।

এবং অবাক-বিস্ময়ে দেখলুম প্রাক্‌স্বাধীনতা ও উত্তর-স্বাধীনতা জল-বিভাজিকার মতো দুটো যুগকে সম্পূর্ণ ভাগ করে দিল। দুটি পর্ব যেন

বিচিত্র আলাদা। কোনো পর্ব কোনো পর্বের কাছে ঋণ-স্বীকার করে না। যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা প্রাক্-পর্বে লক্ষিত ছিল, পর-পর্বে সেগুলোই বাহুল্য বলে বর্জিত হল।

সাহিত্যিক আর অভিজ্ঞতার জন্যে বাইরেকে আনবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। তিনি অভিজ্ঞতার জন্যে আত্মমুখীন হলেন। কখনো পারিবারিক ঘরোয়া জীবন, কখনো ব্যক্তিজীবনই প্রাধান্য পেতে শুরু করল। কাজেই বাস্তববাদী সমাজ সম্পর্কিত গল্পের ধারা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অন্ধকূপে আবদ্ধ হল। গল্প-লেখক প্রচার করলেন: 'আমার অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো বাস্তবতা নেই।' এবং 'আমার সাহিত্য, আমারি সাহিত্য, সেখানে আমারি বিচিত্র মানস-অভিজ্ঞতার সাহিত্যায়ন মুহূর্তে মুহূর্তে ঘটে চলেছে। আমি জীবনকে বুঝতে চাই, to understand এবং আমি যেভাবে জীবনকে বুঝছি, বুঝতে পেরেছি, তাই সাহিত্যে লিখতে চাই। যাঁরা আমার মতো ভাবেন তাঁরাই পাঠক, বৃহত্তর পাঠককে আমার প্রয়োজন নেই।'

ফলে যা হবার তাই হল। সর্বাধিক প্রচারিত 'দেশ' পত্রিকার দৌলতে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক গল্পধারার জন্ম হল। এই ধারার শক্তিশালী লেখকদ্বয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও বিমল কর। এবং এঁদেরই অনুগ্রহভাজন কিছু তরুণ লেখককুল।

এমন কি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের সমাজমুখীন লেখকেরাও ধীরে ধীরে এই অধ্যায়ের লেখকদের সঙ্গে মিলে গেলেন।

এখন যা কিছু সমাজমুখীন রচনা আজকের যুগ-লক্ষণের চোখে সেকেলে বলে পরিগণিত হল। গল্পে সমাজ-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। গল্পে কাহিনী বর্জন। চরিত্রচিত্রণ অনাবশ্যক। মানস কণ্ডুয়ন ছাড়া গল্পে কিছু নেই। এমন কি জীবন নিয়ামক অর্থনীতির জটিল অংকটাও বাড়তি হয়ে গেল।

এর ফলে গল্পপাঠকদের কী সুবিধে হল জানিনে, তবে লেখকদের মহা সুযোগ হল, অভিজ্ঞতার দারিদ্র্যকে রীতির আংরাখায় গোপন করে প্রদর্শনী করবার অধিকার জন্মাল। এবং প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করবার দায়িত্ব যখন দেশ পত্রিকা নিয়েছে তখন উদ্‌বেগের কারণ নেই।

নতুন শ্লোগান কানের কাছে হর্দম বাজানো চলল: 'রীতিই হচ্ছে গল্প। 'কী বলব' নয় 'কেমন করে বলব'—তাই মুখ্য। অক্ষম রচনাগুলি এক্স-

পেরিমেণ্টের তকমা পেয়ে শূন্য আসরে পারম্পরিক হাততালির পৃষ্ঠপোষণায় মুখরিত হয়ে উঠল।

আর, ভেসে গেলেন কুশলী গল্পকার তারাশঙ্কর, সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্র, নবেন্দু ঘোষ। তাঁরা ভয়ংকর রকমের সেকেলে।

নতুন ট্রেড মার্ক নিয়ে পিতলকে চকচকে করে তুললেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং বিমল কর চক্র।

গল্প, কবিতা হল, চিত্র হল, জ্যামিতি হল, গল্প হল না। পাঠক নতুন রীতি ছেড়ে দিয়ে ছুটলেন নিম্নমানের উপন্যাসের খোঁজে।

কিন্তু স্বাভাবিক পরিণামে এই নতুন রীতির হুজুগও একদিন নিঃশেষ হয়ে গেল। দেখা গেল জ্যোতিরিন্দ্র বিমল কর শূন্যগর্ভ আন্দোলনে ক্লান্ত হয়ে ঐতিহ্যের বশম্বদতাকে মেনে নিলেন। জন্ম হল 'বালিকা বধূ'-র।

আসলে এই আন্দোলনের নেতৃবর্গরাই নতুন রীতিসর্বস্বতাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন নি। তার কারণ শূন্যের উপর কোনো আন্দোলন হয় না। যেহেতু সাহিত্য চলমান জীবনেরই সঙ্গী। জীবনশূন্যতার রক্তহীন আন্দোলন বেশিদিন চলে না।

ফলে নতুন রীতির এই তথাকথিত আন্দোলনের শবব্যবচ্ছেদ করলে একটা নির্লজ্জ সত্যই মুখব্যাদন করে ওঠে। সেটা Plagiarism. সাধুভাষায় যাকে বলা যায় কুম্ভীলক-বৃত্তি। অর্থাৎ কখনো ফকনার, কখনো মোরাভিয়া, কখনো কামু, কখনো মানের কাছে হাত-পাতা। নতুন রীতিঅলারা বেমালুম পল্লবগ্রাহিতা করেছেন। আঙুল দিয়ে সে চৌর্যকে ধরিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ লেখকেরা নিজেই তাঁদের অপকীর্তি সম্পর্কে সচেতন।

তাহলে কী রবীন্দ্রনাথের পর 'নতুন গল্প' বলে কোনো বস্তুর সৃষ্টি হয়নি? 'নতুন' শব্দটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে। নতুনত্ব নিশ্চয়ই বিষয়ে এবং প্রকাশে। বাঙলা সাহিত্যে নেই বলেই বিদেশী সাহিত্যের নকলনবীশিপনা এদেশে 'নতুন' বলে কী শিরোপা পাবে! পরগাছা কখনোই বৃক্ষের গৌরব পেতে পারে না।

নতুন গল্প তাকেই বলতে রাজি আছি, যা বর্তমান বুর্জোআ সমাজজীবনের জটিলতাকে তুলে ধরতে সক্ষম। এই জটিলতার অর্থ উলঙ্গ যৌনবাদ নয়। কারণ যৌনতার আকর্ষণ সর্বযুগেই সমান। নিশ্চয়ই একে যুগধর্ম বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করলে অতি সরলীকরণের অপরাধ ঘটে। সমাজজীবনের

যে সর্বাত্মক সংকট ব্যাধির মতো ফুটে উঠেছে, তার প্রকাশ প্রতিটি স্তরে। 'শিরে কৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা' – জাতীয় অবস্থা।

সংকট বিশ্বাস এবং বিশ্বাসভঙ্গের।

সংকট বিবেকের।

স্থূল শারীরিক সুখ, বিজ্ঞানের সুলভ সুযোগ মানুষের ধ্রুপদ মূর্তিকে ভেঙে চুরে দিচ্ছে।

প্রজ্ঞার দারিদ্র্য আর একটি লক্ষণ।

সমস্ত রকম আন্তরিকতা আজ উপহসিত। এমন কি পেশাগত সততাও অদৃশ্য।

অর্থ নৈতিক নিরাপত্তাবোধও আজ অস্তগমিত।

এই সকল লক্ষণ যাকে আমরা 'নতুন গল্প' বলব তার শরীরে কী চিহ্নিত হয়েছে! এই সেদিনও পর্যন্ত টমাস মান, কামু, ফকনার—বুর্জোআ জীবনের জটিলতাকে তাঁদের গল্পে পরিবেশন করে গেছেন। বিস্ময়ের বিষয়, আমাদের দেশে এই সব বিদেশী গল্পকারদের ভাঁড়ারে সিঁধ কাটা হয়েছে, কিন্তু বিকৃত রুচি অনুযায়ী তাঁরা এই লেখকদের বিশেষ উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করেছেন! এমন কি মোরাভিয়ার জীবনসত্যকে খণ্ডিত করে উলঙ্গ যৌনতার চ্যাটচেটে রসকে এদেশে কাজে লাগানো হয়েছে। টমাস মানের Black Swan চুরি করা হয়, Early Sorrow গ্রহণ করবার রুচি দেখা যায় না। মোরাভিয়ার Bitter Honeymoon গল্পগ্রন্থটি এদেশে জনপ্রিয়, Roman Talesএর কথা মনে পড়ে না। ফকনারের গল্প এখানে বাঙলা নামধারণ করে দিব্যি বাহবা কুড়োয়।

এদেশে এ সবই ঘটছে। এবং বনেদী পত্রিকার ছত্রছায়ায় থেকে এদের পল্লবগ্রাহিতার স্খলন সাধারণ্যে প্রকাশ করবার সুযোগ থাকে না।

সৌভাগ্যের বিষয় সাম্প্রতিক বিশ্বসাহিত্যের ছোটোগল্প সম্পর্কে আমার কিছু পরিচয় আছে। একথা অস্বীকার করবাব উপায় নেই যে বিশ্বে ছোটো গল্পের দিন ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। এরি মধ্যে সম্ভবত পশ্চিম জার্মানীতেই সোৎসাহে ছোটগল্পের একটা প্রবল জোয়ার এসেছে। তার পরই আমেরিকা ও ইতালী। এই সকল দেশের যুদ্ধোত্তর এবং সাম্প্রতিক গল্পগুলির সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ঘটেছে। সেখানে দেখেছি যুগের যন্ত্রণাকে দুঃসাহসের সঙ্গে বহন করে ছোটগল্প জয়যাত্রায় বাহির হয়েছে।

এবং তাঁরা নির্লজ্জ যৌনতাকেই তাঁদের একমাত্র বিষয় করেন নি।

আমাদের দেশের গল্পকার কিংবা পাঠকগণ এই সকল সাম্প্রতিক গল্প পড়ে দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

জার্মান গল্পকারদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত—হাইনরিখ ব্যোল, এবং হুলফ্‌গাঙ বরশার্ট। এছাড়াও আছেন ইলসে আইশিঙ্গার, হ্যানস বেন্‌ডার, গ্রাট্রুড ফাসনেগ্‌গার প্রমুখ।

ইতালির গল্পকারদের মধ্যে আছেন—মারিয়ো সোলদাতি, নাতালিয়া গিনৎবার্গ, কার্লো এমিলিও গাদ্দা, ইতালো কালভিনো, কার্লো কাসোলা, সিজার পাভেস, ভাসকো প্রাতোলিনি প্রমুখ।

আমেরিকান গল্পকারদের মধে উইলিয়াম সারোয়ান মাইক কুইন প্রমুখ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ একটি সাক্ষাৎকার

॥ ১ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : সাহিত্যের হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। দালালি করে পাটের ব্যবসা করা যায়, লেখক হওয়া যায় না।

চুপ। চুপ। চুপ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : আমি মানুষ হিসেবে সর্বদাই সর্বহারা শ্রেণীর পাশে। আরো দশজন খেটে-খাওয়া মানুষের মতন আমিও একজন লেখার মজুর। সাহিত্যিক বলে সমাজের কাছে আমার বিশেষ সুবিধে নেবার অধিকার নেই।

মানিকটা গোল্লায় গেল! কম্যুনিস্ট পার্টি ওকে শেষ করে দিল! কম্যুনিস্ট মানিকের লেখক-প্রতিভা নিঃশেষ!

অহো, পুতুল নাচের ইতিকথা। অহো, দিবারাত্রির কাব্য। অহো, চতুষ্কোণ।

ছোট বকুলপুরের যাত্রী? চিহ্ন? সোনার চেয়ে দামী? আজকাল পরশুর গল্প?

না না, প্রোপাগাণ্ডা। শিল্পরস খর্বিত।

সুতারকিন স্ট্রিট সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

মাসি ভেবেছিলেন পাই-পাই করে আরো দশজনের মতন মানিকবাবু খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বেন!

পাঠক বলুন, মানিকবাবু কী খিড়কির আশ্রয় নিয়েছিলেন?

॥ ২ ॥

মানিক হেসে বললেন : লেখাটা যে-শ্রেণী–সংগ্রামের কত বড় হাতিয়ার আগে বুঝিনি। ওরা আমার নাকের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বীকার করে নিল লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর যাই হোন্ ওদের রক্ষিতা নন্। আমি কাদের জন্য লিখছি, কাদের জন্যে সত্যিকার আমাকে লিখতে হবে,

এই চিন্তাটা আমার কাছে সূর্যালোকের মতন স্পষ্ট হয়ে এল।

মানিকবাবু আপনার কী বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত আছে?

মানিক হাসলেন: সমাজে যখন শ্রেণী রয়েছে তখন কোনো না কোনো শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত তো আমার থাকবেই। ছাখো, আমার দেশের অধিক মানুষেরই যখন নিজের ঘর নেই, আহার নেই, অর্থ নেই, তখন আমি লিখে বাড়ি-গাড়ির স্বপ্ন দেখি কী করে? সেটা তো আমার শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার শামিল হবে।

কিন্তু আপনার পরিবার, ছেলেপিলে?

তাদের দুমুঠো খেতে দিতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব।

॥ ৩ ॥

মানিকবাবু আপনার লেখক হয়ে-ওঠার গল্প বলুন?

বাজি ধরে লেখা অতসীমামীর গল্প তো অনেকবারই বলেছি?

বললাম: বাজি ধরে গল্প লেখা আমি বিশ্বাস করি না। ব্যাপারটার মধ্যে স্টাণ্ট আছে।

মানিক হা হা করে হাসলেন। ঠিকই বলেছ। লেখকের প্রকাশ হওয়াটা হঠাৎ হতে পারে কিন্তু তার প্রস্তুতি দীর্ঘকাল নিঃশব্দে চলে।

অমন রোম্যাণ্টিক গল্প আপনি কেন লিখলেন?

কী জানি, বোধকরি আমার মধ্যে সেই তরুণ বয়েসে এ ধরনের একটা বোহিমিয়ানিজম কাজ করে থাকবে।

কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে আপনি কী একাত্মতা বোধ করেন?

কেন? একথা বলছ কেন? বিচিত্রা গোষ্ঠী নয় কেন?

প্রাগৈতিহাসিক গল্পে আপনি নিদারুন মর্বিড। অবিশ্যি বোহিমিয়ানিজম তখনো ছাড়েননি।

মানিক চিন্তিত হলেন। তারপর বললেন: কী জানি, মর্বিড শব্দটা তোমরা গালাগালির অর্থেই বলছ কিনা। ছাখো আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জীবনকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার কায়দাটা প্রথমাবধি আমার সাহিত্যে হাজির। একে আমার দৃষ্টিভঙ্গি, বড় করে বললে, আমার লেখক ব্যক্তিত্বও বলতে পারো।

আপনি কী কোনো দর্শনের কথা বলছেন?

না, কেতাবী দর্শন আমার তেমন পড়া নেই। ডাক্তারদের রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে যেমন অভিজ্ঞতা হয় আমার তেমনি জীবন সম্পর্কে একটা বোধ জন্মে গেছে।

তাই কী আপনার অনেক চরিত্র প্যাথলজিকাল স্টাডি হয়ে দাঁড়েছে।

লেখবার আদিপর্বে এমনটি ঘটা অসম্ভব নয়। সম্ভবত আরো দশজনের মতন আমিও ভাবতাম মানুষের নির্জ্ঞান মনের কাণ্ডকারখানাটাই তার জীবনকে সুস্থ স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। আমার আশা ছিল নির্জ্ঞান মনের জটিলতাকে যদি উদ্‌ঘাটন করে দিতে পারি তাহলে রোগ ধরা পড়লে যেমন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয় তেমনি মানুষ একদিন স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে?

শেষ পর্যন্ত আপনি কী এই নির্জ্ঞান মনেরই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন?

বোধহয় তাই। মার্কসবাদের জ্ঞান যেদিন আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল সেদিন নতুন করে উপলব্ধি করলাম সবার উপরে অর্থনৈতিক অবস্থাটাই মানুষের সমূহ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

জীবনকে দেখার এই মর্বিডিটি কী আপনার লেখকজীবনকে কিছু সাহায্য করেছে?

মানিক হাসলেন। ছ্যাখো জন্মেই তো কেউ মার্কসবাদী হয় না, তাহলে তো মার্কসবাদই মিথ্যা হয়। আমার মেণ্টাল মেক-আপ-কে তো একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না! যেমন ডস্টয়ভসকি আর টলস্টয়, মনোভঙ্গির কারণেই উভয়ের রচনার আকাশ-পাতাল তফাত। তা ছ্যাখো রোমান্টিসিজমের ভূতটা যে আমাকে তেমন কায়দা করতে পারেনি সেটা এক দিক থেকে বাঁচোয়া। মর্বিড বলো অথবা রিয়ালিস্টিকই বলো, তার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেটা এই: এক্ষেত্রে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে হয়। রোমাণ্টিকদের মতো চোখ বুজে কল্পনা করে নিলেই চলেনা। হ্যাঁ একথা ঠিক আমার গোড়ার সাহিত্যে অসুস্থ মানুষ নিয়ে বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করতে পারি না চরিত্রগুলো যথার্থই অসুস্থ। সীমাবদ্ধ চিন্তার কারণেই আমার সেদিন বুঝতে বিলম্ব হয়েছিল বিরূপ সমাজ ব্যবস্থাই এর জন্যে দায়ি। রোগটা আমি ধরেছিলাম ঠিক, কিন্তু রোগের মূল উৎপত্তির ক্ষেত্রটা ধরতে প্যারিনি। আমি আবারও বলছি মানুষ জন্মগত মার্কসবাদের অধিকার নিয়ে জন্মায় না।

|| ৪ ||

লোকে বলে এই মার্কসবাদে বিশ্বাস আপনার শিল্পীসত্তাকে ক্ষুণ্ন করেছে। এবিষয়ে আপনার অভিমত জানতে ইচ্ছা করে।

মানিক হেসে বললেন : তোমরা কী বলো ?

আজকে আপনার কথাই শুনব।

মানিক হেসে জবাব দিলেন। না। মার্কসবাদ তো একটা ডগ্‌মা নয়, বিশ্বকে দেখবার বিশেষ একটা কৌশল। লেখকের মার্কসীয় দর্শন আয়ত্ত থাকলে তার লেখায় কোনো যান্ত্রিকতা আসতে পারে না। এটা নির্ভর করে খাঁটি লেখক সত্তার ওপর। একটু অহংকারের মতো শোনাচ্ছে, যদিও আমি জানিনা কতদূর খাঁটি হতে পেরেছি, তবে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

পার্টির নির্দেশ কী কখনো আপনাকে মানতে হয়নি ?

পার্টি আমাকে নির্দেশ করবে কেন ? রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কোনো বিপ্লবী পার্টির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই।

এটা নীতির কথা।

তুমি তো নীতিগত প্রশ্নই তুলছ, তাই না ?

ধরুন রাজনীতিগত একটা অ্যাকশন ভুল হচ্ছে সেক্ষেত্রে সংস্কৃতিফ্রণ্টের কর্মী হিসেবে আপনার কী কর্তব্য হবে ?

মানিক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : তুমি তেভাগা আন্দোলনের কথা বলছ ?

যদি বলিই ?

ত্যাখো আমি এইভাবে জিনিসটাকে ভাবি : জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কৃষকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করছেন। সেখানে লোক হিসেবে নয় সচেতন মানুষ হিসেবেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তাঁদের আন্দোলনের যুক্তিযুক্ততা। আমি বিনাবাধায় সে-সংগ্রামের কাহিনী লিখতে পারি। লিখেছি ছোট বকুলপুরের যাত্রী-তে, লিখেছি হারানের নাতজামাই শীর্ষক গল্পে। রাজনীতিগত প্রশ্নটা কতদূর সঠিক ছিল সেটা ভাবার থেকে কৃষকদের সংগ্রামী চরিত্র তুলে ধরাই আমার পক্ষে জরুরি ছিল। কারণ আমি বিশ্বাস করি কখনো কোনো আন্দোলন কোনো কারণে সার্থক না হলেও তার প্রেরণা মুছে যায় না। যতদূর মনে পড়ে গর্কির 'মাদার' ১৯০৫-এর বিপ্লবেরই ফসল।

গর্কির 'ব্লাডি সানডে'-র ওপর গল্পটি বিশ্বাসঘাতক আন্দোলনের ওপর রচিত হলেও ভবিষ্যতে তার ঐতিহাসিক প্রেরণা শেষ হয়ে যায়নি।

মানিক সিগারেট ধরালেন। কেন? যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাংগার ওপর অসংখ্য গল্প আমাদের মতো মার্কসবাদী লেখকেরাই লিখেছেন। নারাণবাবু, সুশীলবাবু, রমেশবাবু, নবেন্দুবাবু…

আমি এ ব্যাপারে তর্ক তুলছি না।

না-তর্ক করেও বলা যায় এঁরা মার্কসবাদী হওয়া সত্ত্বেও পার্টির কাছ থেকে কোনো নির্দেশের প্রার্থী ছিলেন না।

হেসে বললাম: সে তো অমার্কসবাদী লেখকেরাও লিখেছেন।

মানিক বললেন: তাহলেই বুঝুন এই বিশেষ পর্বে আমরা মার্কসবাদী লেখকেরাই নেতৃত্ব দিয়েছি। সে সময়ে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে আমরাই প্রভাবশালী অংশ। একথা বলা ভুল হবে না যে অন্যেরা আমাদের প্রভাবেই এজাতীয় বিষয় নিয়ে লিখতে বাধ্য হন্। তারাশঙ্করবাবুর মতন অনেকেই সেদিন আমাদের কাছাকাছি এসেছিলেন, আসতে হয়েছিল তাঁদের।

বললাম: ওঁরা চলে গেছেন।

মানিক হাত নেড়ে বললেন: সে কথা থাক। সে সব ইতিহাস আমাদের সকলের জানা।

কথাটা হচ্ছিল—

বুঝেছি। লেখক যদি যথেষ্ট শক্তিশালী না হন তাহলে আদত দর্শন না বুঝে বারবার রাজনৈতিক ফতোয়াকে গল্পে রূপ দিতে চেষ্টা করে তিনি যান্ত্রিক হয়ে পড়েন। ফতোয়া যদি পরবর্তী কালে ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর গল্পও ব্যর্থ হয়। হয়েছে।

তাহলে?

তাহলে কী? সে তো হবেই। লেনিন তাঁর রাজনৈতিক কর্মীদের সাবধান করে দিয়েছেন যেন গর্কিকে সব সময় বিরক্ত করা না হয়। তার অর্থ কী? খুব পরিষ্কার। লেনিন জানতেন বিপ্লবী পার্টির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক কর্মী এবং সাহিত্যকর্মীর কাজের দুটো ভিন্ন চরিত্র আছে। পার্টির কাছে শস্তা হাততালি পাবার উৎসাহে লেখক যদি আন্তরিক সৃজনশীলতাকে বিসর্জন দিয়ে পার্টির তাৎক্ষণিক লাইন অনুযায়ী ফরমায়েশি গল্প লিখতে বসেন তাহলে পার্টির দোষ নয়; দোষ লেখকের। মার্কসীয় দর্শনে যদি আপনার

চৈতন্য অভিষিক্ত হয়ে থাকে তাহলে আপনার কোনো রচনাই মার্কসবাদ তথা পার্টিবিরোধী হতে পারে না। অন্তত আমার জীবনে এমন দৃষ্টান্ত নেই।

হেসে বললাম : গান্ধীমহারাজকে উপলক্ষ করে আমাদের সুকান্তর কবিতা রচনার প্রেরণার মূলে কী পার্টিলাইন নয়?

মানিক বললেন : সুকান্ত বেঁচে থাকলে এর জবাব দিতেন। তবে আমি বিশ্বাস করি শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী শিল্পী একজন শ্রেণী-সমন্বয়ে বিশ্বাসী মানুষের বন্দনা রচনা করবেন না। সুকান্ত বেঁচে থাকলে এবং মার্কসীয় দর্শনে তাঁর সার্থক উপলব্ধি ঘটলে সম্ভবত তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করতেন। উপস্থিত আমরা সুকান্তর কাব্যে ভিন্নতর প্রেরণা খুঁজব। আশা করি আমরা তা পাবই।

আচ্ছা মানিকবাবু, সত্যি করে বলুন দেখি আপনার কোন ক্ষোভ নেই?

আছে। নিজের ওপরই আমার ভীষণ ক্ষোভ। কেন আমি খাঁটি হতে পারছিনা, কবে আমি সত্যিকার লেখক হব। আমি অনেককে বলেছি লেখক হতে চাইলে মনেপ্রাণে চাষা হয়ে যান। কিন্তু আমি কী তা হতে পেরেছি, মনে হয় না।

বুর্জোআ সমাজের ওপর আপনার ভয়ানক রাগ, তাই না?

সব সময় তো রাগতে পারিনা। আমার লেখা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক বুর্জোআ প্রকাশকরাই তো ছাপছেন।

তাহলে এঁদের বদান্যতা আপনি স্বীকার করেন?

ওঁরা ব্যবসাদার মানুষ ওঁদের কাছে মানিকই বলুন আর হরিদাস পালই বলুন, একই দরের। হয়তো কিছু বই বিক্রিও হয়।

তাহলে দেখুন আপনি প্রকাশকের সমস্যায় কখনো পড়েন নি?

বুর্জোআ প্রেস তো ভুল করে আমার কিছু প্রচার আগেই করে ফেলেছে। তাছাড়া সংস্কৃতিফ্রন্টে এখন আমাদের যে বৃহস্পতি-দশা চলেছে সে-ব্যাপারটাও প্রকাশকের কাছে কম আগ্রহের বস্তু নয়। আমার পিছনে তাবৎ প্রগতিশীল শক্তির দাপটটা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। চতুর প্রকাশক ব্যবসার খাতিরে এ-সুযোগকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

তাহলে বলতে চান কোনো কারণে চাকা ঘুরে গেলে প্রকাশকেরা আপনাকে বিমুখ করতে পারেন।

করলে আশ্চর্য হব না।

আচ্ছা আপনি রয়্যাল্টি ঠিকমতন পেয়ে থাকেন?

আদায় করতে হয়। এ-ব্যাপারে আমাকে বেশি ঘাঁটায় না ওরা। জানে তো আমি মোটেই ভদ্দরলোক নই। এই আধ ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি আর পায়ের চটি ছাড়া আমার বাড়তি পোশাক নেই। আমি যখন টাকা চাইতে আসি তখন ওরা দস্তুরমতন জানেন রেশন তুলতে হবে। সকলেই জানেন পেটের ক্ষুধা কোনোরকম ভদ্রতা রক্ষা করে চলে না। সেদিন টাকা চাইতে গিয়ে যেমন হল! প্রকাশক বললেন: ভাই, টাকাটা কালকে নিলে হয় না? একটা পেমেণ্ট করতে হবে। দ্যাখো আমার বড় মেয়েটা কদিন থেকে জ্বরে ভুগছে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন টাইফয়েড। টাকার অভাবে আমি হন্যে হয়ে রয়েছি। প্রকাশকের উচ্চাঙ্গের রসিকতায় এমন কাঁচা খিস্তি শুরু করলাম যে টাকা দিয়ে আমাকে পত্রপাঠ বিদায় করে উনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

বললাম: সাহিত্যের অবস্থা তো এই। চেষ্টা করলে কী আপনি একটা ভালো চাকরি পাননা? আপনার আত্মীয়স্বজন তো···

মানিক বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা দস্তুরমতন বড়লোক। এমন বড়লোক যে আমার বৃদ্ধ বাবা আমার মতন গরীব ছেলের কাছেই থাকতে ভালবাসেন। কি বলছিলে বাঁধা চাকরি? তা কী চেষ্টা করে দেখিনি? তাহলে চাকরি করাই হয় লেখা হয় না। আমি যেদিন থেকে বুঝেছি লেখা ছাড়া আমার দ্বিতীয় কাজ নেই সেদিন থেকে লেখাকেই আঁকড়ে ধরেছি। লেনিন প্রফেশনাল রেভলিউশনারির কথা বলেছেন, আমিও প্রফেশনাল লেখক হতে চাই। পার্টটাইমার নয়, হোল্‌টাইমার লেখক।

হেসে বললাম: আপনি লেখেন কখন? বাজার-রেশন থেকে যাবতীয় কাজ তো আপনাকেই করতে দেখি। তারপর সভাসমিতি আছে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ আছে...

মানিক বললেন, যে কাজ করতে চায় তার সময়ের অভাব হয় না। বাজার রেশন সবরকমের কাজেই আমার আগ্রহ আছে। এবং সব ধরনের কাজেই আদি ও অকৃত্রিম লেখক মানিকব ন্দ্যোপাধ্যায় বিরাজমান। বাজারে মেছুনী কী শবজিঅলা, তাদের মুখ, হাবভাব, চরিত্র আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখি, রেশনের মালিকও আমার দৃষ্টি থেকে এড়ায় না। এরা সকলেই আমার লেখক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে রয়েছে। গল্পে যখন শবজিঅলার চরিত্র আঁকি

তখন আমাকে কষ্ট কল্পনা করতে নয় না. চেনা লোককেই সহজে এনে হাজির করি। লেখকেরা তো পদ্মভুক নন, নিতান্ত সাধারণ একজন সামাজিক জীব, তাকে বাজার করতে হয়, রেশন তুলতে হয়। আরো দশজন মানুষ যেমন করে আর কী।

আপনি কী প্রগতি লেখক-আন্দোলন সম্পর্কে আশাবাদী?

একশোবার। আজ পর্যন্ত বিশ্বে মার্কসবাদই একমাত্র প্রগতিশীল দর্শন।

আপনি কী মনে করেন যথার্থ সাহিত্যিকের পক্ষে মার্কসবাদ অবশ্যই গ্রহণীয়?

হ্যাঁ তাই। এই বিশেষ জ্ঞান সমাজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষের সঙ্গে উৎপাদন শক্তির সম্পর্ক, সামাজিক দ্বন্দ্ব, যাবতীয় জটিলতা বোঝবার চাবিকাঠি। চাবি যাঁর হাতে নেই তিনি অন্ধের মতো পথ হাতড়াবেন, লক্ষ্য খুঁজে পাবেন না। অবশেষে অজ্ঞানতার জালে আটকে পড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন। অমার্কসবাদী লেখকদের শেষ অবস্থা তো দেখাই আছে, ভাঙা সমাজব্যবস্থাকে রক্ষার জন্যে অপটু মিস্ত্রির মতো এখানে চুনকাম করছেন, ওখানে পলেস্তারা, শেষ পর্যন্ত হুড়মুড় করে মাথার ছাদটা ধসে পড়ছে। ভাঙা সমাজটাকে নিয়ে মড়াকান্না আর কতদিন চলতে পারে? এর প্রয়োজন শেষ হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি এর গঙ্গাযাত্রা হয় ততই মঙ্গল। হ্যাঁ আমরা প্রগতিশীল লেখকেরা ভাঙা ব্যবস্থাকে ভিতশুদ্ধ ভাঙতে চাই, কারণ নতুন সমাজব্যবস্থার জন্যে মানুষের চিন্তাকে প্রশস্ত করতে হবে। এই আশাতেই বেঁচে আছি, এই আশাতেই আজীবন কলম চালিয়ে যেতে হবে। তোমরা কী বলো?

গণসাহিত্য প্রসঙ্গ

মার্কসবাদ এমন একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি যার কল্যাণে আমাদের বিশ্ববীক্ষা জন্মে গেছে, এইরূপ অনায়াস নিশ্চিন্তি প্রায়শ-ই বিভিন্ন সমস্যাবলীকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছে। মার্কসবাদের শক্তি পেয়ে নিজেকে প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভাবার চেয়ে 'আমি কিছু জানিনে' এই সংশয় অনেক লাভজনক বলে মনে হয়। এই মুহূর্তে আমি যদি প্রশ্ন রাখি 'গণসাহিত্য' কাকে বলে উত্তর আসতে বিন্দুমাত্র দেরী হবে না। কারণ সোভিয়েত বিপ্লবের দলিল আমাদের হাতে আছে। কিন্তু আমরা একবারও ভেবে দেখতে অভ্যেস করিনে রাশিয়ার ক্ষেত্রে গণসংস্কৃতি বা গণাসহিত্যের বাস্তব প্রয়োগ ও সিদ্ধি আছে, কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে তার তাৎপর্য আলাদা।

আলাদা এইজন্যই যে গণসংস্কৃতি বা গণসাহিত্যের ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। রাশিয়ার জনগণের বিপ্লবের মাধ্যমেই সোভিয়েত সমাজবিন্যাস গড়ে উঠেছে এবং তারই ফলশ্রুতি গণসংস্কৃতি তথা গণসাহিত্য। অপিচ 'গণসংস্কৃতি' বা 'প্রলেটারিয়ান কালচার' শব্দটি অত্যন্ত অপরিষ্কার, যেহেতু প্রলেটারিয়ান কালচার বলে নতুন কোনো বস্তু সৃষ্টি হয় নি, ওর নাম 'সোস্যালিস্ট কালচার'। কোনো কালচার-ই অতীতকে পুরোপুরি বর্জন করে স্বয়ম্ভুরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। ফিউডাল কালচারকে গ্রহণ-বর্জন করে যেমন বুর্জোআ কালচার দাঁড়িয়েছে তেমনি সোস্যালিস্ট কালচারও বুর্জোআ কালচারকে প্রয়োজনমতো গ্রহণ ও বর্জন করেছে। সম্ভবত এই কথা ভেবেই লেনিন বিপ্লবোত্তর অত্যুৎসাহী 'প্রলেটারিয়ান কালচার'-এর উদ্যোক্তাদেব সতর্ক করেছিলেন। তিনি পুশকিনকে বাদ না দিয়ে তাঁকে অধ্যয়নের উপরই জোর দিযেছিলেন।

আমাদের দেশে যাঁরা গণসংস্কৃতি বা গণসাহিত্য বিষয়টি নিয়ে আন্তরিক উৎসাহ দেখান তাঁদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন: সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে বাস্তবে গণসংস্কৃতি বা গণসাহিত্যের জন্ম হতে পারে কি! ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই যদি গণসংস্কৃতি ইত্যাদি গড়ে উঠতে

পারে তাহলে ব্যাপারটা অত্যন্ত বিনা মজুরিতেই অর্জন করা যায়। কিন্তু আমার মার্কসবাদের দরিদ্রতম জ্ঞান সত্ত্বেও এমন অসম্ভব ব্যাপারে বিশ্বাস নেই।

ধনতান্ত্রিক সমাজে যখন শ্রেণী আছে তখন একথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই বর্তমান অবস্থায় সাহিত্যমাত্রই শ্রেণী-সাহিত্য। এবং কে না জানে গণসংস্কৃতির অন্তরের কথাই হচ্ছে শ্রেণীহীন সংস্কৃতি। অথচ রাশিয়া থেকে 'গণসংস্কৃতি' বিষয়টাকে আমদানী করবার সময় এদেশের পণ্ডিতেরা সমাজ সম্পর্কের সহজ প্রশ্নটাকেই এড়িয়ে গেলেন। ফলে গণসংস্কৃতির প্রবল বন্যায় যে গণসাহিত্য গড়ে উঠল সেখানে লেখকরাও 'গণ' নন, পাঠকেরা তো নন‌ই। এবং যে গণের জন্য সাহিত্য গড়ে উঠল সে 'গণ' দুর্নিরীক্ষ্য। তাই বানানো গণসাহিত্য গড়ে উঠল। বস্তুত 'গণ' কথাটা বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করেছি, mob অর্থে নয়, প্রলেটেরিয়ান অর্থে। নিশ্চয়ই রামায়ণ মহাভারত-রসিক গণের কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

সমাজ–সম্পর্কের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে অতীতে যে গণসাহিত্য আমরা সৃষ্টি করলাম তার অকালমৃত্যুই অবাস্তবতাকে প্রমাণ করছে। সেখানে শ্রমিক-চাষী এসেছে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক আদর্শবাদিতার দর্পণে। এবং রাশিয়ার অনুকরণে আমাদের ধারণা হয়ে গেল গণসাহিত্য মানেই শ্রমিক-চাষীর জীবন দেখানো। গণসাহিত্যিকের ন্যূনতম শর্ত মনেপ্রাণে শ্রমিক-চাষী বনে যাওয়া অথবা সেই জীবন থেকে উঠে আসা, সেইটেই গেলাম ভুলে। এবং কেমন করে ধারণা করে ফেললাম ধনী বা মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত চরিত্র অংকন গণসাহিত্যের বিষয় হতে পারে না। ফলে মার্কসবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও একটি 'নীলদর্পণ'-এর জন্ম দিতে পারলাম না!

ওই কল্পিত 'গণে'র কথা ভাবতে গিয়ে আমরা বুঝে গেলাম ওরা শ্রম-জীবনের ঘেরাটোপের বাইরে বৃহত্তর কিছু ধারণা করতে অক্ষম। যেন কাস্তে আর হাতুড়ির বাইরে তাদের কোনো জীবনবোধ নেই! কী করে এটা বুঝলাম, আমার ধারণা নেই। অথচ সুদূর মধ্যযুগ থেকে এই জনসাধারণ (গণ অর্থে নয়) একদা মঙ্গলগান, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির আস্বাদ গ্রহণ করেছে! তাহলে আমাদের এই 'গণ' শেকসপীয়র-পুশকিন-টলস্টয় বুঝবে না এমন ভাববার অধিকার আমাদের কে দিল! কোন্ অধিকারে

তাদের হাত থেকে আমরা ফিউডাল এবং বুর্জোআ সংস্কৃতির মূল্যবান ফসলগুলিকে কেড়ে নেবো!

প্রকৃত প্রস্তাবে 'গণ' সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা ছিল যান্ত্রিক, অনেকটা রাজনৈতিক সরলীকরণের অনুযায়ী। যেমন শ্রমিক-চাষী মাত্রই জঙ্গী, বিপ্লবী ইত্যাদি। অথচ তাই যদি হত তাহলে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং পার্টিগঠনের কোনো অর্থ থাকত না। জন্মগতসূত্রে কেউ বিপ্লবী হয়ে জন্মায় না। শ্রমিক চাষীদের পক্ষেও একথা সত্য। মধ্যবিত্ত বা বুর্জোআদের মতোই তাদেরও দ্বন্দ্ব আছে, মানবিক দোষ-ত্রুটি-পাপ-লোভ—কাম আছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক জ্ঞানই তাদের শ্রেণীচেতনা আনতে পারে। mob এবং প্রলেটেরিয়েটে যে পার্থক্য তা সচেতন জ্ঞানেরই পার্থক্য। এই যান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলেই সাম্প্রতিককালের 'কমরেড' উপন্যাস লেখকের অভিজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা সত্ত্বেও যান্ত্রিকতাকে পরিহার করতে পারেনি। বাইরে থেকে পার্টিনেতাদের গ্রামে আসার পর চাষীদের মনোজগতে কী করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল সেই প্রয়োজনীয় স্তরগুলি লেখক উপেক্ষা করে গেছেন। তার ফলে চাষীজীবনে এই অসামান্য পরিবর্তনগুলি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

পুরনো কথায় ফিরে আসি। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে সাহিত্যমাত্রই শ্রেণী-সাহিত্য। এবং সাহিত্যিক তাঁর চিন্তা-ধারণা-স্বার্থানুযায়ী একেকটি শ্রেণীকে বেছে নেন। আজকের দিনে তথাকথিত unconsoious সাহিত্যিক বলে কিছু নেই। সমাজের স্থিতস্বার্থে যাঁরা সুবিধে খুঁজে পান তাঁরা অবশ্যই কায়েমী শ্রেণীচক্রের সঙ্গে হাত মেলাবেন। আর, যাঁরা সামাজিক পরি-বর্তনে বিশ্বাসী তাঁরা নিশ্চয়ই বিপ্লবীশ্রেণীদের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ করবেন। এবং যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের কথা শিল্পে বলবেন তাঁদের নির্দ্বিধায় 'প্রগতি-শীল' সাহিত্যিক আখ্যা দিতে পারি। নিশ্চই 'গণসাহিত্যিক' বলব না।

আমাদের মুশকিল হচ্ছে 'প্রগতি' এবং 'গণ'-কে সমার্থক করে ফেলি। এই করাটা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।

সমস্ত ধনতান্ত্রিক বিশ্বে যে সকল সাহিত্যিক সামাজিক—প্রগতির কথা বলেছেন তাঁদের গণসাহিত্যিক না বলে আমরা প্রগতিশীল সাহিত্যিক আখ্যা দেবো।

এখন প্রগতিশীল সাহিত্যগোষ্ঠীকে বিচার করে দেখা যাক। বস্তুত

এঁরাও দুটো ভাগ। একদল পার্টিসাহিত্যিক, আর একদল দলনিরপেক্ষ। অবশ্য উভয়দলের মিল মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির কমবেশি স্বীকৃতির ক্ষেত্রে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বা নবেন্দু ঘোষের কিংবা রমেশচন্দ্র সেনের মূলগত পার্থক্য আছে। কিন্তু প্রত্যেককেই আমরা প্রগতি-শীল আখ্যা দিতে পারি। সাহিত্যিক পার্টিকর্মী হলে তাঁর প্রতি দায়িত্ব গুরুতর। কারণ তাঁর একেশ্বর সাহিত্যিক হলেই চলে না তাঁকে সাহিত্যিক ফ্রন্ট গঠনেরও সাংগঠনিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। যা এককালে গর্কিকে করতে হয়েছিল।

আমরা আশা করতে পারিনে সমস্ত প্রগতিশীল সাহিত্যিক একটি বিশেষ পার্টির আনুগত্যে আসবেন। এমনকি মার্কসীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান সত্ত্বেও। কারণ এই দেশেই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এমন ছোট-বড়-মাঝারি পার্টির সংখ্যা কম নয়। এবং আশা করছি গণবিপ্লবের আগে প্রয়োজনের তাগিদে আরও অসংখ্য পার্টি জন্মাবে। অন্তত প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় এমন নজির আছে।

প্রগতিশীল সাহিত্যিকগোষ্ঠীদের বিচারের সময় এই বৈশিষ্ট্যগুলি সাহিত্যিক ফ্রণ্টে কল্যাণ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সাহিত্যিকফ্রন্টে পার্টিসংগঠনের একটি ভূমিকা আছে অবশ্যই। তা সহসঙ্গীদের পরিহার করে নিজেদের পবিত্র ত্রাণকর্তা ভাবার মধ্যে নয়। সেটা রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা হতে পারে, কোনো মার্কসবাদী পার্টির নয়।

কারণ মার্কসবাদই সর্বপ্রথম এই বৈশিষ্ট্যগুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এবং মার্কসবাদ কোনো dogma নয়, একটি বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সেইখানেই তার প্রাণশক্তি, অমরত্ব।

এছাড়া আরো একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। সেটা সৃজনধর্মের সঙ্গে জড়িত। একথা স্বীকৃত যে সৃষ্টির পিছনে রয়েছে একটি ব্যক্তিমানস। অবশ্যই এই ব্যক্তিতা সামাজিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ায় গঠিত। এবং এর সঙ্গে শিল্পীর মানসিক গঠনের (mental make-up) গুরুত্বকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি নে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদের নজর সমষ্টির উপর, ব্যক্তির উপর নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতাকে আমরা অস্বীকার করতে গেলে ভুল করব। একজন পার্টি-সাহিত্যিকের পক্ষেও একথা প্রযোজ্য। যেহেতু যূথপ্রবৃত্তি

সৃষ্টির সহায়ক নয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার গরজেই শিল্পীর একাকিত্ব, এবং একেশ্বর-বোধ থাকা আবশ্যিক। সৃষ্টিকর্মে ব্যস্ত থাকার সময় গর্কিকে যেন বিরক্ত করা না হয়, এরকম একটি নির্দেশ লেনিন কর্মীদের দিয়েছিলেন, স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারছি।

তাহলে সংগঠনের কী কাজ হবে, এই প্রশ্নটা আসছে। মনে করা যায় মার্কসবাদী পার্টি নিশ্চয়ই conducted tour-এ বিশ্বাসী হবেন না। কারণ ফরমায়েসী সাহিত্য–সৃষ্টি বুর্জোয়া বাজারের জন্য লিখিত হতে পারে। যেমন হচ্ছে ঐতিহাসিক রোমাঞ্চক সিরিজ। পার্টির কাজ এক্ষেত্রে শিল্পীকে মার্কসবাদ সম্পর্কে সচেতন করা। এবং তারপর শিল্পী কী লিখবেন সেটা তাঁরই ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। সেটা যৌথখামারের ওপর হতে পারে, কারখানার চিমনির ওপর হতে পারে, কিংবা অন্যকিছু সুস্থ জীবনবোধেরও ওপর হতে পারে। চাইকি প্রেমবিষয়ক হলেও নিন্দনীয় হবে না। মায়াকভস্কি, ব্লক, গর্কি তিনজনই সোভিয়েত লেখক, কিন্তু বিষয়বস্তু চয়ন কিংবা মানসিক-গঠনে এঁরা অন্যপরতন্ত্র। এবং প্রেমকে বিষয় করেও যে প্রগতিশীল সৃষ্টি সম্ভব আরাগঁর কবিতাই তার প্রমাণ। ঐতিহাসিক কাহিনী লিখে যেমন হাওয়ার্ড ফাস্ট।

শিল্পীর ব্যক্তিমানসের বৈচিত্র্যই সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ। এবং এটাই সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার অভিব্যক্তি।

আসলে মার্কসবাদে দীক্ষিত সাহিত্যিক যা লিখবেন তা সর্বসময়েই প্রগতির শক্তি জোগাতে বাধ্য। তা মিল মালিকের চরিত্রই হোক, কি দালালের চরিত্রই হোক, কি চাষী মজুরের চরিত্রই হোক।

কারণ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আয়নাতেই তিনি এসকল চরিত্রের সামাজিক মূল্য নির্ণয় করেন।

পরিশেষে এইটেই আমার নিবেদন মার্কসবাদের যে উত্তরাধিকার পেয়েছি তাকে ভুল বুঝে কিংবা অল্প বুঝে যেন যান্ত্রিক ধারণায় না পর্যবসিত করি। কারণ সে শিকল আমাদেরই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অথর্ব করে রাখবে।

শেষ